আনন্দমেলা
১.৫০

এখন দারুণ আশ্চর্য করা,
মিষ্টি স্বাদে ভরা!

নিউট্রিন

লিকার্স

মোলায়েম মিষ্টি স্বাদে ভরপুর!
যা হল নিউট্রিন প্রতিভারই সৃষ্টি!

nutrine

চাকুম চুকুম খাসা মিষ্টি দিয়ে ঠাসা!

নিউট্রিন কনফেকশনারি কোং লিঃ, পালমানের রোড, চিত্তুর-৫১৭০০২ (অন্ধ্র প্রদেশ)

CAS NC 47 80 BEN-C

আনন্দমেলা

২ পৌষ ১৩৮৭ • ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮০ • ৬ বর্ষ • ১৮ সংখ্যা

বিশেষ রচনা
শিকার উৎসবে। সোমনাথ চক্রবর্তী ৪

উপন্যাস
হারানো কাকাতুয়া। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৫
সিসের আওটি। বিমল কর ৪৭

বড় গল্প
দুইজন সন্ধানী। সমরেশ মজুমদার ১০

গল্প
নয়নচাঁদের বাড়িতে। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ২৬
মোরগের ডাক। আরতি দাস ৩৬
টুম্পার বন্ধুরা। আশিস ঘোষ ৫৪

স্মৃতিকথা
বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ১৯

ছড়া
আসল রাজা। অরুণ সরকার ২৮
হঠাৎ ওঠে কেঁপে। প্রদীপকুমার চক্রবর্তী ৫৩

খেলোয়াড়ের আত্মকথা
উইং থেকে গোল। পি.কে. ৫১

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
রোভাসের রয় ৩০, টিনটিন ৩২
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪

খেলাধুলো
মহামেডানের দিগ্বিজয়। অশোক দাশগুপ্ত ৪২
ক্রিকেটের বিদ্বান। রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৪৫

লেখাপড়া
ভাষার খেলা। কুম্ভক ৫৭
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৫৯
'চেতলা গার্লস-এর প্রধান-শিক্ষিকা কী বলেন ৬২
ক্লাস টেন্-এর ফার্স্ট গার্ল ৬৩

অন্যান্য আকর্ষণ
ছবির মজা ২৭, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
মণিমেলার খবর ৩৮, তোমাদের পাতা ৩৯
আঁকো-শেখো ৬৬

অমলরাজের পুরোপাতা রঙিন ছবি ৪১

প্রচ্ছদ চিত্রজিৎ ঘোষ

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং দেশ পাবলিকেশনস (প্রা) লিমিটেড, ২৬৭ রয়াপেটা হাই রোড, মাদরাজ ৬০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

আগামী সংখ্যায়

ঘোড়া থেকে বিদ্যুৎ

কলকাতা-ট্রামের শতবর্ষ উপলক্ষে
তাক-লাগানো লেখা

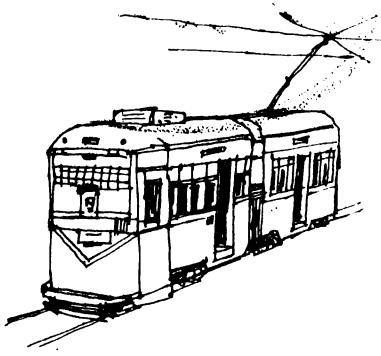

সেইসঙ্গে
আরও অজস্র আকর্ষণ

শিকার-উৎসবে

সোমনাথ চক্রবর্তী

এক রাত্তিরের মধ্যে কী এক ভেল্‌কিতে রুল্‌কু বড় হয়ে গেল। এবার বড়দের মতো তাকেও তোড়জোড় শুরু করতে হবে। দূরে পাহাড়ের রাজ্যে শিকারের ডাক পড়েছে।

রুল্‌কু আদিবাসী সাঁওতাল ছেলে। কাদুড় গা, কালো রঙ। ঝিরঝিরে ঝরনা-ছোঁয়া লালমাটির টিলা। একপাশে আকাশ-প্রমাণ পাহাড়, শালের বন। লাল টুকটুকে খাপরা-ছাওয়া একসার ঘর। সাঁওতালদের গ্রাম। ওখানেই রুল্‌কুদের বাড়ি। বৈশাখী পূর্ণিমার আগের দিন সকাল-সকাল বড়রা গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। অন্যদিনের মতো কাঁধে হাল-কোদাল নিয়ে নয়, ঝুলবে তীর ধনুক, শক্ত হাতের মুঠোয় ধরা বল্লম, কোমরে বাঁধা তলোয়ার, কাঁধে ঝকঝকে টাঙি। বিরাট বিরাট ভেরী, ওরা যাকে বলে ধামসা, বেজে ওঠে বুক কাঁপিয়ে।

ওরা কিন্তু মোটেই যুদ্ধ করতে যায় না।

মুখে-মুখে ছড়ায় শিকারের গল্প

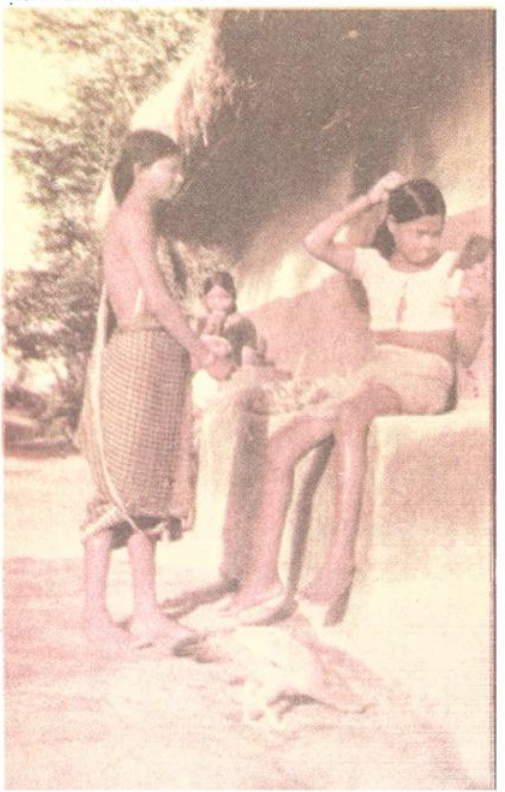

শিকারে বেরোয়। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন সমস্ত সাঁওতাল গ্রামের পুরুষরা বেরিয়ে পড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে। ঠিক যেমনভাবে রাজা-মহারাজেরা মৃগয়ায় বার হত এককালে। শুধু রাজাদের থাকত বন্দুক, হাতির পিঠে চেপে, চতুর্দোলায় চড়ে সিপাই-সান্ত্রী লোক-লশকর নিয়ে তাঁবু খাটিয়ে রাজভোগের সঙ্গে সঙ্গে শিকারের আয়োজন হত। আদিবাসী শিকার-পরবে এত আড়ম্বরের বালাই নেই। আদিম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হাজার-হাজার মানুষ দলে-দলে এসে বছরে একটা দিন জঙ্গলে ঘুনো জন্তুর মুখোমুখি হয়ে শিকারের খেলা খেলে।

প্রতি বছর শিকারের আগে গ্রামের মজলিশে ঠিক হয় এবারে কে যাবে না-যাবে। বছর-বছর শিকারের গল্প শুনতে-শুনতে ছোটরাও যাবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। কিন্তু একদম খোকাটি থাকলে শিকারে সঙ্গী হবার অনুমতি মেলে না। আসা বারণ মেয়েদেরও। শিকারিরা গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলমুখো হলেই মেয়েরা শিকারের গল্প করে, গান বাঁধে আর ঘরের লোকের ফেরার অপেক্ষায় সময় গোনে। বড়রা যখন বোঝে কোনো ছেলের শরীরে শক্তি আছে, তীর ধনুকেও অব্যর্থ টিপ, তখনই ডাক পড়ে তার শিকারে যাবার জন্য। যেমন এ বছর রুলকুর পালা। মাথায় তার পাগড়ি, ওপরে ময়ূরের পালক গোঁজা। মাল-কোঁচা মারা ধুতি পরে কাঁধে ছাতুর পুঁটলি নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। কখনও বা সঙ্গে থাকে একপাল কুকুর। সবারই হাতে অস্ত্রশস্ত্র, মুখে গান।

বৈশাখী পূর্ণিমার শিকার-পরবকে সাঁওতালরা বলে দিসুম সেন্দরা। শিকার-পরবের সবচেয়ে বড় মেলা বসে অযোধ্যা পাহাড়ে। পুরুলিয়ার ধার ঘেঁষে বাঘমুণ্ডিতে অযোধ্যা পাহাড়ের শুরু। একটু দূরের মাঠাবুরুতে দুর্গম চড়াই-উতরাই। শাল শিমুলের গভীর জঙ্গল। খাড়াই পাহাড়ের এক-এক জায়গায় দিনের আলো মাটি ছোঁয় না। জঙ্গলে বন্যজন্তুরও অভাব নেই। তারই টানে শিকারের দিন দূর দূরান্তের আদি-বাসীদের ভিড় জমে পাহাড়ে, জঙ্গলে।

জঙ্গলের দুই শিকারি

ঝরনা পার হচ্ছে সতর্ক শিকারি

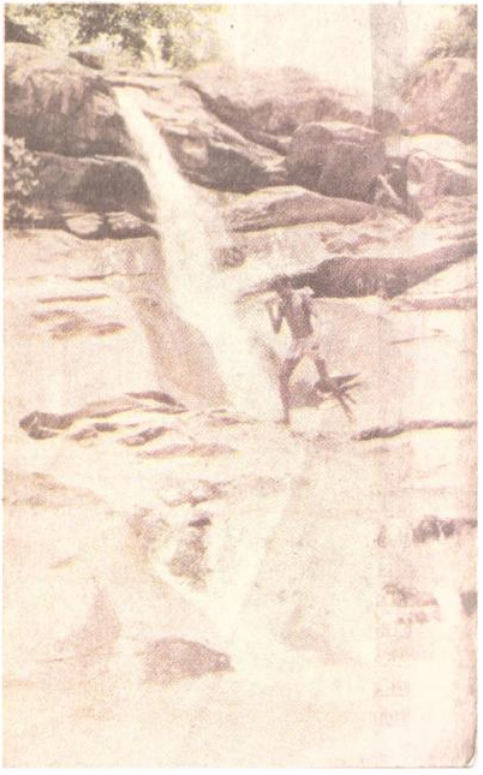

শিকারিদের মাংস-ভাগ

ভালুক মারার পরে

নাচে অংশ নেয় ছোটরাও

বছর-বছর এ পরব এখানেই হয়ে আসছে। বনবিভাগের অনুমতি ছাড়া জঙ্গলে কাঠ কাটা, শিকার করা নিষিদ্ধ হলেও প্রতি বছরে এই একটা দিন আদিবাসীরা শিকারের নেশায় এখানে চলে আসে।

পাকা শিকারির দল আগে থেকেই ঠিক করে নেয় যে, কী শিকার করবে। তারপর হাত ধরাধরি করে এগোয়। অযোধ্যা পাহাড়ের দু-দুটো পাহাড়ি ঝরনা—বামনি আর টুরগায় আশেপাশে জন্তুরা জল খেতে আসে। শিকারি গাছ থেকে নজর রাখে সেদিকে। জন্তু-জানোয়ারের পায়ের শব্দ ওঠে শুকনো পাতায়। অমনি গাছ থেকে নেমে আসে শিকারিরা। দলবল চারদিক থেকে ছড়িয়ে এগোয়। তারপর একবার জন্তুটাকে নজরে পড়লেই হৈচৈ করে দামামা বাজিয়ে তাড়া করে কোনঠাসা করে ফেলে সেটাকে। অযোধ্যা পাহাড়ে প্রতি বছর শিকার-পরবে দু চারটে বুনো দাঁতাল শুয়োর মারা পড়ে। এখানে হাতির পালেরও অভাব নেই। আশ্বিন মাসে ফসল পাকার সময় হাতিরা পাহাড় থেকে নেমে এসে গ্রাম আর খেত তছনছ করে। শিকারের সময় বাচ্চা হাতির গায়ে হাত পড়লেই মুশকিল। উঁচু গলায় চেঁচিয়ে

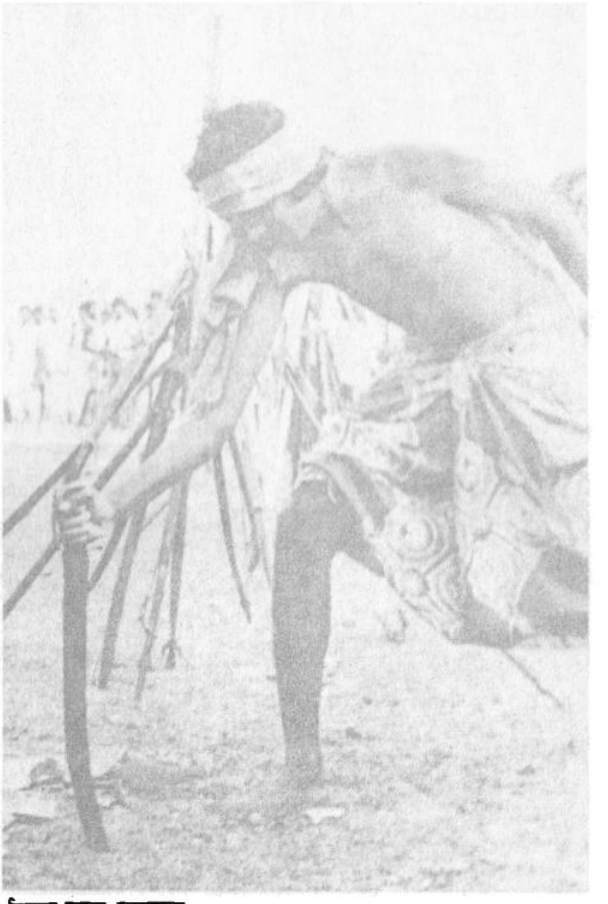

শিকার-যাত্রার অয়োজন

জানিয়ে দেয় পাহাড়ের মতো উঁচু গণেশ হাতিদের। হাতির পাল খেপলে তুলকালাম কান্ড ঘটে যায়। তাই সাঁওতাল শিকারিরা হাতিকে চটায় না। বরং হাতিকে পুজো করে। এ জঙ্গলে ভালুকের সংখ্যা বেশি। বুনো কেঁদফল আর মহুয়ার গন্ধে ওরা ঘোরাঘুরি করে। পাহাড়ের গহ্বরেই ওদের বাস।

এ বছরে সিংভূম থেকে আসা একদল শিকারি দুপুর নাগাদ মাঝরাস্তায় দেখল একটা ভালুক পাথরের চাঁই পেরোচ্ছে। ব্যস আর যায় কোথায়! হা রে রে রে করে দল বেঁধে চারদিক থেকে এগিয়ে এল সবাই। তারপর তীর ছুঁড়তে শুরু করল।

ভালুকটা ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়াল একসময়। পেছনে খাড়াই পাহাড়। পালাবার পথ নেই। সুতরাং সামনেই লাফিয়ে পড়ল। একজন শিকারির হাতের অস্ত্র ছিটকে পড়ে আচমকা ধাক্কায়। উঠে দাঁড়ায় ভালুকটা। দু পায়ে এগোয়, ঝকঝক করে ওঠে তার শানানো নখ। এক মুহূর্তের জন্য বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল লোকটার। পাশ থেকে এক-জন মনে করিয়ে দেয় তার কোমরে গোঁজা ছুরির কথা। এবার ভালুকটা ঝাঁপিয়ে পড়তেই লোকটা সরে গিয়ে জন্তুটার ঘাড়ে

ছুরিটা আমূল গেঁথে দেয়। ভালুকও ছেড়ে কথা বলেনি। নখের আঁচড় বসিয়েছে শিকারির সারা শরীরে।

তীর-ধনুক, টাঙি, বর্শার মতো অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও শিকার চলে ফাঁদ পেতে, জাল দিয়ে। ময়ূরভঞ্জের শিকারিদের তৈরি লতার মোক্ষম জালে দুপুরবেলায় দেখা যায় একজোড়া হরিণ জড়িয়ে পড়ে আছে। অযোধ্যার জঙ্গলে বাঘের চেয়ে চিতা আর নেকড়ের সংখ্যাই বেশি। শিকারিরা বলে, সারা বছর এরা জঙ্গলে দাপাদাপি করলেও শিকার • পরবের দিন অন্যান্য পশুপাখির মতো এরাও গা ঢাকা দেয়। শিকারে বেশি করে ধরা পড়ে ময়ূর,

পাখি শিকারের মহড়া

বুনো খরগোশ, বক তিতির, সজারু। প্রথম বছর জঙ্গলে এসে খুদে শিকারিরা একটা পাখি কি কাঠবেড়ালিও পেলে তাদের রীতিমত বীর বলা হয়।

রুলকু কিন্তু সারাদিনে কিছুই পায়নি। সারা জঙ্গল জুড়ে হৈচৈ, ঢাক বাজছে। দুজন জোয়ান বুনো শুয়োর মেরে ঝরনার জলে ডুবিয়ে রাখে। মাংস টুকরো করে শালপাতার টুকরিতে ভাগ করে। রুলকুর গা ঘেঁষে বসে গাঁয়ের কুকুর ভল্লু। সেও মাংসের ভাগ পাবে। রুলকু ঝরনার ঘোলা জলে ছাতুর পুটলি ডোবায়। ভল্লু লেজ নাড়ে। বুনো শালের পাতায় ছাতু মেখে দুভাগ করে নেয়।

শিকার-পরবের নাচ

খাওয়া শেষে আবার চলা। চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় রুলকু। ভল্লু কোথা থেকে ডাক ছাড়ছে—ভৌ ভৌ। কাছে গিয়ে দেখে ও মাটি আঁচড়াচ্ছে। সামনেই পাথরের গায়ে একটা গর্ত। সাহস করে তীরের আগাটা ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে। পুঁটলির মতো নরম-নরম কী যেন ঠেকে। শরীরের সমস্ত শক্তি উজাড় করে পাথর সরাতে লেগে যায় রুলকু। পাথর একটু আলগা হতেই সোজা হাত ঢুকিয়ে দেয় গর্তের ভেতরে। দুটো বাচ্চা খরগোশ। আনন্দে ফেটে পড়ে রুলকু।

রাত হতেই হাজার শিকারি জড়ো হয় পাহাড়ে। মশালের আলোয় সারা রাত ধরে চলে গান। মাদল বাজে সেই সঙ্গে। সারারাত রুলকুর দুচোখের পাতা এক হয় না। ছাতুর পুঁটলিটা এখনও ওর কাঁধে শক্ত করে বাঁধা। পুঁটলিটা মাঝেমধ্যে নড়ে উঠলেই রুলকু ফিসফিসিয়ে ধমক দেয়, "চুপ, নড়িস না। ওরা দেখতে পেলে এক্ষুনি খেয়ে নেবে।

ভোর হতেই বাড়িমুখো পা বাড়াবে শিকারিরা। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় পাথরে মাথা দিয়ে শুয়ে রুলকু স্বপ্ন দেখে, ঘরের উঠোনে বাচ্চা খরগোশ দুটো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

(রঙিন ফোটো সোমনাথ চক্রবর্তী তুলেছেন। সাদা-কালো ফোটো সৌগত রায় বর্মণের তোলা।)

এরও লক্ষ্য আকাশের পাখি

দুইজন সন্ধানী

সমরেশ মজুমদার

॥ ৩ ॥

অনেকটা সময় লাগল নিজেদের সামলে নিতে। ওরা যখন উঠে দাঁড়াল, তখনও হাঁটু কনকন করছে, সারা শরীর ব্যথা। গাঙ্গুলি সাহসটাকে ফিরিয়ে আনল পায়ে কঙ্কালের সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল, "আরে শ্যাস, দ্যাখো চাকু, এটাকে একটা কাঠের সঙ্গে ফিক্সড্ করে রাখা হয়েছে যাতে পড়ে না যায়। তার মানে এটা ইউসলেস, ভয় পাওয়ার কিছু নেই।" সাহসী মুখে সে হাসতেই ওপাশের বিছানাটা দেখতে পেল। দুজনের শোওয়ার ব্যবস্থা, কিন্তু খাটের চার-পাশে চারটে কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে বিনীত ভঙ্গিতে, ওদের আঙুলের ডগায় মশারির ফিতে বাঁধা। যেন চারজনে মশারিটা ধরে আছে ভদ্রতা করে। ঠিক সেই সময় চাকলাদার ঠাস করে একটা মশা মারল গালে। একে এইসব, তারপর কী বিরাট মশা। হায় ভগবান! গাঙ্গুলি আর- একবার মশারির দিকে তাকিয়ে গুটিগুটি পায়ে চাকলাদারের পাশে হেঁটে এল, "লোকটা হয় পাগল, নয় আমরা পাগল হয়ে যাব। তাকিয়ে দ্যাখ, চারটে কঙ্কাল মশারি ধরে দাঁড়িয়ে আছে।" ভয় পেতে পেতে মানুষের নার্ভ এমন একটা জায়গায় চলে যায় যখন আর কিছুই তাকে নাড়া দিতে পারে না। চাকলাদারের এখন সেই অবস্থা। সে অসহায় চোখে বিছানাটা লক্ষ করে বলল, "ওখানে শোব কী করে?"

গাঙ্গুলি বলল, "মশার হাত থেকে বাঁচতে ওছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া ওগুলো খাটের সঙ্গে ফিক্সড করা। ভয় পেয়ো না চাকু, এখন ঠান্ডা মাথায় প্রত্যেকটা পয়েন্ট আলোচনা করা যাক।" রিভলভারটা হাতে নিয়ে সে বিছানায় গিয়ে বসতেই অনেকটা দোলা লাগল শরীরে। বেশ স্পঞ্জ গদিতে, রাজসিক ব্যাপার! চারজন মানুষ আমাদের মশারি ধরে থাকবে সারা রাত। এসো চাকু।" চাকলাদার খুব সতর্ক পায়ে বিছানায় এসে বসল। সে কোনও দিকে না তাকিয়ে বলল, "কঙ্কাল আর মানুষ এক হল?"

ঠিক সুস্থ মাথায় আলোচনা করা যাচ্ছে না, কারণ প্রচন্ড মশা আর শীতটাও বেশ জেঁকে আসছে। কোনওরকমে মশারিটা ফেলে দিতে চারধারে বেশ ফিনফিনে পাঁচিল ওদের আড়াল করল। ওরা দেখল, লোকটা, মানে এই বাড়ির মালিক, অত্যন্ত ধূর্ত, কারণ সারাদিন তাদের বাইরে বসিয়ে রেখেছে, বেশিক্ষণ কথা বলেনি এবং বলার ভঙ্গি সুবিধের নয়। বাড়িময় এত কঙ্কাল ছড়ানো যা স্বাভাবিক কোনও মানুষ রাখতে পারে না। নিশ্চয়ই খুনটুন করে লোকটা। কিন্তু এত খুন একটা মানুষ কীভাবে করে সেটা ওদের মাথায় ঢুকছিল না। আর করবেই বা কেন? এইসব ভাবতে ভাবতে ওদের নরম বিছানায় বসে ঝিমুনি এসে গেল।

আটটা নাগাদ চাকরটা এসে ওদের ডেকে নীচে নিয়ে এল। টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। রুটি, মাংস আর সন্দেশ। ঘুমের চোখ থাকায় নেমে আসতে অসুবিধে হয়নি। এখন ভদ্রলোককে দেখে ওদের আচমকা সব মনে পড়ে গেল। চাকলাদার দেখল একটা কঙ্কালকে সাদা চামড়া পরালে ওঁর মতো দেখাবে। একটু হোঁচট খেয়ে সে খাবারে হাত দিল।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, "কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

গাঙ্গুলিকে ঘাড় নেড়ে না বলতে দেখে

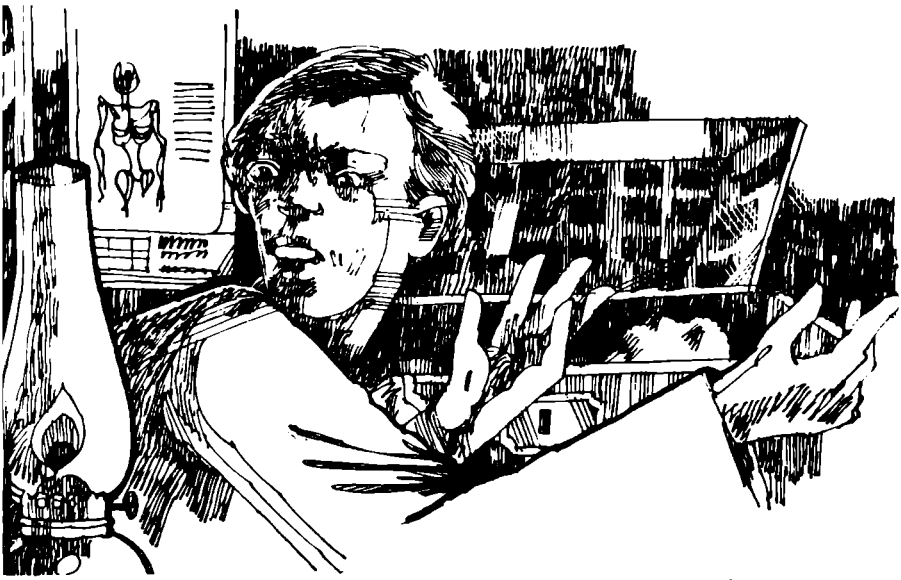

চাকলাদার অবাক হল। সে আর থাকতে না পেরে বলে বসল, "আচ্ছা, আপনার বাড়িতে এত কঙ্কাল কেন?"

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "কঙ্কাল বলবেন না। ওরা অস্থিপঞ্জর। কঙ্কাল শব্দটায় একটা ভুতুড়ে গন্ধ আছে। কেমন দেখলেন? আপনারা যে ঘরে শুয়ে ছিলেন সেখানে যিনি অস্থিপঞ্জর মাথায় আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি অসম্ভব সুন্দরী ছিলেন।"

গাঙ্গুলি ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞাসা করল, "মেয়েছেলের কঙ্কাল, মানে অস্থিপঞ্জর?"

ঘাড় নাড়লেন ভদ্রলোক, "হ্যাঁ। আমার সংগ্রহে এখন পর্যন্ত একশো-তিনটে আছে। এদেশে ওদের যোগাড় করা খুব ডিফিক্যাল্ট। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পার্সোনাল কালেকশন রোডেশিয়ার মিস্টার বার্কলের, দুশো তিরিশ। কতরকমের স্পেসিমেন আছে, যার সব আমি এখনও পাইনি। যেমন ধরুন, তিনফুট উঁচু বামনের। বাচ্চাছেলের অস্থিপঞ্জর বামন বলে চালানো যায় না। আবার সাড়ে ছয় ফুট লম্বা অস্থিপঞ্জর আমার নেই।" ভদ্রলোকের হাসিটা দেখে চাকলাদারের শরীর হিম হয়ে গেল। বলে কি লোকটা? ঠিক ওই উচ্চতা তার শরীরের। লোকটা প্রায়ই মানে সে এই বাড়িতে ঢোকা অবধি তার দিকে ঘনঘন তাকাচ্ছে কী উদ্দেশ্যে। তাকে কঙ্কাল বানাবার মতলবে কি এখানে জায়গা দিয়েছে? চাকলাদারের আর খাওয়া হল না। তাই দেখে ভদ্রলোক বিনীত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "রান্না কি খারাপ হয়েছে?" অমনি চাকলাদার আবার খাবার নিয়ে ভয়ে ভয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। খাওয়া শেষ করে গাঙ্গুলি বলল, "আপনার হবিটা কিন্তু অদ্ভুত ধরনের!"

"তাই কি?" ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "অনেকে কয়েন জমায়, স্ট্যাম্প রাখে, আমার হচ্ছে এটা। আপনার অদ্ভুত মনে হচ্ছে, কিন্তু একজন সাধারণ বাঙালিকে যদি কয়েনের গল্প বলেন সেও বলবে অদ্ভুত।"

"কিন্তু কয়েন তো বিক্রি হয়, এগুলো কী কাজে লাগবে?"

"প্রচুর দাম মশাই। ধরুন, আপনার কাছে শেক্সপীয়রের ডান হাত আছে। এবার তার ঐতিহাসিক মূল্যটা ভাবুন? মোহনলালের শরীরটা পলাশির মাঠেই পড়ে ছিল। আমার কাছে ওর অস্থিপঞ্জর আছে। অন্যদের থেকে তার ফর্মেশনের মধ্যে একটা আলাদা কম্পোজিশন আছে।"

"সিরাজদৌল্লার মোহনলাল?" চাকলাদার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না।

"ইয়েস! বল্লালসেনের মাথার খুলি দেখবেন?"

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস... সুস্থ সবল দাঁত

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিন্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য কর্মপদ্ধতি কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দু'ইই দূর করে।

ফলাফল: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

DC.G.74 BN

"না, না, ঠিক আছে।" চাকলাদার সামলে নিল।

আমাদের মানে হিন্দুদের সিস্টেমটার জন্য কিছু প্রিজার্ভ করা মুশকিল। চিতার আগুন সর্বগ্রাসী। যাক, আপনারা তো কাল সকালেই যাবেন? যাওয়ার আগে দেখা হবে। শুভরাত্রি।" আচমকা কথা শেষ করে ভদ্রলোক উঠে গেলেন। পাশের দরজা দিয়ে যাওয়ার সময় চাকলাদারের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যে, ওর মনে হল, শরীরের চামড়া মাংস, রক্ত সব ঝরে গেছে। সে একটা সাড়ে ছ'ফুট কঙ্কাল হয়ে বসে আছে।

চাকরটা সামনে থাকায় ওরা ওখানে কথা না বলে ওপরের ঘরে ফিরে এল। ঘরে ঢুকেই চাকলাদার ভেঙে পড়ল, "আমার প্রমোশন দরকার নেই, ইনক্রিমেন্ট চাই না, আমি এখান থেকে এখনই পালাতে চাই গাঙ্গুলি।"

"কী করে? লোকটার তোমাকে ভাল লেগেছে। ডেঞ্জারাস লোক।" গাঙ্গুলি ভাবছিল। চাকলাদার দ্রুত জানলার কাছে গিয়ে সেটাকে পরীক্ষা করল। শিকগুলো খুলে ফেলা অসম্ভব নয়। এখান দিয়ে নীচে লাফিয়ে নামা যায়। মাথা গলিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল সেখানে ফণিমনসার ঝোপ, পড়লে সুবিধে হবে না। চাকলাদারের মনে পড়ল ফেলুদার গল্পে পড়েছে যে, একটা লোক তার হবির জন্য খুন করতে দ্বিধা করেনি। আর এক্ষেত্রে খুন করলে তো হাতে হাতে কঙ্কাল লাভ। কান্না পেয়ে গেল ওর।

গাঙ্গুলি বলল, "ঘাবড়ে যেও না চাকু। এখানে আমাদের এনিমি হল দুজন লোক। একজন রোগা পটকা বেঁটে, আর একজন বৃদ্ধ চাকর। আমাদের দুটো রিভলভার আছে। অতএব আমরাই আপারহ্যান্ড নিতে পারি। আমার খুব সন্দেহ, যে ছেলেটিকে আমরা ধরতে এসেছি সে এই বাড়িতেই আছে। এটা ঠিক কি না দেখতে হবে।"

"কখন দেখবে? আমি মরে গেলে ও তোমাকে জ্যান্ত ফিরতে দেবে ভেবেছ?"

"আমার মত কঙ্কাল ওর দরকার নেই।"

"কিন্তু সাক্ষী, কেউ সাক্ষী ছেড়ে দেয়?"

"হুঁ। গাঙ্গুলি এবার চিন্তিত হল, "শোনো, আক্রান্ত হওয়ার আগেই আক্রমণ করা ভাল। চলো যাই।" গাঙ্গুলি পকেট থেকে রিভলভার বের করে সেটা ঠিকঠাক করে নিল। বসে বসে মরে যাওয়ার চেয়ে এটা খারাপ নয়। চাকলাদার বলল, "কোথায়?"

"বাড়িটা সার্চ করব। কেউ বাধা দিলে গুলি করবে। সামনে কঙ্কাল পড়লে তাকাবে না। প্রথমে নীচের তলায়। যে ঘরটায় লোকটাকে বারবার যেতে দেখেছি ওই ঘরটায় চলো।" প্রায় মরিয়া হয়ে চাকলাদার এক হাতে রিভলভার অন্য হাতে ব্যাগ নিয়ে গাঙ্গুলির সঙ্গে পা টিপে-টিপে দোতলা থেকে নেমে এল। খাওয়ার টেবিল পরিষ্কার। চাকরটা নেই। পাশের দরজা দিয়ে নিঃশব্দে ওরা ঢুকে দেখল একটা লম্বা প্যাসেজ। প্যাসেজের দুপাশে চারটে ঘর। প্রথম ঘরের দরজা খুলতেই অন্ধকারে চিমসে গন্ধ নাকে এল। লোকটা নিশ্চয়ই বাতি জ্বালিয়ে থাকবে। ওরা তিন নম্বর ঘরের দরজার নীচ দিয়ে আলো দেখতে পেয়ে সতর্ক হল।

দুদ্দাড় করে দরজা খুলে ঢুকে পড়ে গাঙ্গুলি চিৎকার করে উঠল, "হ্যান্ডস আপ। সামান্য নড়লেই গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব।" গাঙ্গুলির গলা ও হাত কাঁপছিল। ভদ্রলোক তখন একটা লম্বা টেবিলের ওপর ঝুঁকে কালো কাপড় টেনে দিচ্ছিলেন। আচমকা এই আক্রমণে কোনওরকমে দুটো হাত ওপরে তুলে বললেন, "কী,কী ব্যাপার?"

"ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। একশো-তিনটে খুনের অপরাধ—না না হাত নামাবেন না। চাকু, ওকে বেঁধে ফেল ওই দড়িটা দিয়ে।" ঘরের কোণে পড়ে থাকা একটা লম্বা দড়ি তুলে চাকলাদার এক লাফে কাছে গিয়ে ভদ্রলোককে বেঁধে বলল, "সাড়ে ছ' ফুটের খুব শখ, আ্যাঁ?"

"আপনারা ভুল করছেন, এসব একদম আইনমাফিক ব্যাপার।" ভদ্রলোক প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন সমানে। চাকলাদার পকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ড বের করে বলল, "লুক হিয়ার। উই আর পোলিস। শাট আপ ইওর মাউথ।"

ভদ্রলোককে এবার ঘাবড়ে যেতে দেখে গাঙ্গুলি বীরদর্পে টেবিলটার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে কাপড়টা খুলে ফেলল। একটা লম্বা কাঠের বাক্স, ওপরে কাঁচ দেওয়া, আর

তার মধ্যে কেউ শুয়ে আছে। উত্তেজিত গলায় সে ডাকল, "চাকু, জলদি, কুইক।" চাকলাদার কাছে এসে ফ্যাসফেসে গলায় বলল, "ডেডবডি। হুম্!" গাঙ্গুলি ততক্ষণে হিপ পকেট থেকে ছবিটা বের করে মিলিয়ে নিল, "ইয়েস, সেম কেস। শুধু ডিকম্পোজড্ হয়ে গিয়ে সামান্য ফুলে গেছে।"

চাকলাদার বলল, "কাটা দাগটা?"

"বডি ফুলে গেলে কাটা দাগ মিলিয়ে যায়। এই যে মশাই, এটা কোত্থেকে পেলেন?

ভদ্রলোক খুব নার্ভাস গলায় বললেন, "ওটা আমি মানে আমার—।"

"থাক থাক আর গুল মারবেন না। চাকু, ডবল প্রমোশন। মার্ডারার প্লাস নিখোঁজ আসামী দুটোই ধরেছি। এখন এ দুটোকে কী করে নিয়ে যাওয়া যায়?" গাঙ্গুলি চাকলাদারের দিকে তাকাতেই চাকলাদার লম্বা পা ফেলে ভদ্রলোকের মাথা রিভলভারের বাঁট দিয়ে আঘাত করতেই তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

চাকরটাকে কব্জা করতে অসুবিধে হল না। ভদ্রলোকের জীপটা গ্যারেজ থেকে বের করে একে একে কফিন এবং দুই আসামীকে তোলা হল। চাকরটাকে খুনের সহযোগী হিসেবে বিশ বছর জেলে রাখা যাবে। দুজনেরই হাত পা ভাল করে বাঁধা। গাঙ্গুলি জীপ চালাচ্ছে। ভদ্রলোক এখনও বেহুঁশ, চাকরটা ভয়ে বোবা হয়ে গেছে। চাকলাদারের মনে এত আনন্দ হচ্ছিল যে গান গেয়ে ফেলল গুন-গুন করে, "আমি বনফুল গো।"

চক্রধরপুর থানার ওসি ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। নিজেদের পরিচয় দিয়ে গাঙ্গুলি তার ওপর খুব তড়পাল, "আপনার এরিয়ায় একশো তিনটে খুন করল লোকটা, আর আপনি ঘুমুচ্ছেন?"

ভদ্রলোককে দেখে ওসির চোখ কপালে উঠল, "আরে এ যে সদাশিব সেন। একে আনলেন কেন? ইনি খুব পন্ডিত ব্যক্তি, জঙ্গলে একা থাকেন পড়াশুনার জন্য।"

"পড়াশুনা?" খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল চাকলাদার, "খুন করার জন্য।"

সদাশিব সেনের জ্ঞান ফিরছিল, বদ্ধ অবস্থায় তিনি বললেন, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনারা আমার অতিথি হয়ে এসে—"

"থামুন।" গাঙ্গুলি চিৎকার করে উঠল, আপনার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ ওই কফিনে আছে। ওসি, পোস্টমর্টেম করতে পাঠান, তাহলেই বোঝা যাবে কী করে মরে গেছে সুভাষ।"

"সুভাষ? সুভাষ দত্ত? যে এখানে এসে লুকিয়েছে?" ওসি বলে উঠলেন।

"হ্যাঁ। ওকে ধরতে এসে এই বিরাট ষড়যন্ত্র দেখতে পেলাম।" গাঙ্গুলি খুব গর্বের সঙ্গে বলল। কফিনটা টেবিলের ওপর রেখে একটা আলো আনা হল। গাঙ্গুলি পকেট থেকে ছবিটা বের করে ওসির হাতে দিল। কালো কাপড় সরিয়ে কাঁচের ঢাকনাটা খুলেই ওসি চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ কী?"

"ফুলে গেছে বলে ওরকম দেখাচ্ছে, কিন্তু মুখটা চিনতে পারবেন।" গাঙ্গুলি বলল। ওসি ততক্ষণে দুহাতে শরীরটাকে নামিয়ে নিয়ে সোজা দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। মাথার চুলের দিকে একটা কালো কাপড় বাঁধা। গায়ে পিঠ-খোলা ফতুয়া আর লুঙ্গি। ওসি খিঁচিয়ে উঠলেন, "এটাকে ডেডবডি বলছেন? মোমের পুতুল আর ডেডবডি এক?"

এবার ভদ্রলোক বললেন, "আমার একটা এক্সপেরিমেন্ট। অস্থিপঞ্জরের ওপর মোম ঢেলে করেছি। এখনও কমপ্লিট হয়নি। আর অস্থি-পঞ্জর? সেসব আশেপাশের গ্রামের মৃত মানুষের। লোকগুলো এত গরিব, পয়সা পেলে দিয়ে দেয়। এর মধ্যে কোনও ক্রাইম নেই।"

ওসি ওদের দিকে ফিরে তাকাতেই দুজনে সুড়ুত করে থানা থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত হাঁটতে লাগল। এখন শেষ রাত। আকাশে তারা সেঁটে আছে এখনও। চাকলাদার ফিস-ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাবে?"

"জাহান্নামে।" চাপা গলায় বলল গাঙ্গুলি।

"তারচেয়ে সেই ভোরের বাসটা ধরে ভুল জায়গায় না নেমে ঠিকঠাক টেবোতে নামলে কেমন হয়? একটা দিনের দেরিতে কী ক্ষতি হবে? জীবনে তো হাজার হাজার দিন পড়ে আছে। ঠিক মেক-আপ হয়ে যাবে, কী বলো?"

(সমাপ্ত)

ছবি সুনীল শীল

আগের কথা : গরাকে কেউ বলে পাগল, কেউ বলে বিজ্ঞানী, কেউ বলে চোর, কেউ বলে স্পাই। এদিকে উদ্ধববাবু এক কাকাতুয়া কিনেছেন। কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই। অন্য জায়গায় আছে।" তারপর...

॥ ২ ॥

কাকাতুয়াকে শেখাতে গিয়ে উদ্ধববাবু ঘেমে ওঠেন। রেগে গিয়ে চেঁচাতে থাকেন: "ইয়ার্কি হচ্ছে? অ্যাঁ! ইয়ার্কি?"

কাকাতুয়াটা একথাটা খুব টক করে শিখে নেয়। ঘাড় কাত করে উদ্ধববাবুর দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বলে, "ইয়ার্কি হচ্ছে? অ্যাঁ! ইয়ার্কি?"

"নাঃ, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। টাকাটাই জলে গেল দেখছি।" উদ্ধববাবু হতাশভাবে এই কথা বলে উঠে পড়লেন। নেয়ে খেয়ে আদালতে যেতে হবে।

কাকাতুয়াটা পিছন থেকে বলল, "টাকাটাই জলে গেল দেখছি।"

আড়াল থেকে কাকাতুয়া ভারসাস উদ্ধববাবুর লড়াইটা ছেলেমেয়েরা রোজই লক্ষ করে।

সেদিন কোর্টে উদ্ধববাবু যখন মামলার কাজে ব্যস্ত, সে-সময়ে একজন পেয়াদা এসে তাঁকে একটা হাতচিঠি দিয়ে বলল, "বাইরের একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। জবাব নিয়ে যাবে।"

উদ্ধববাবু ভ্রূকুটি করে বললেন, "এখন সময় নেই। পরে আসতে বল।"

পরে ভেবে দেখলেন, মোকদ্দমার ব্যাপারে কোনো মক্কেল কোনো পয়েন্ট দিয়ে থাকতে পারে। তাই পেয়াদাকে বারণ করে চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন :

মাননীয় মহাশয়,

কিছুকাল পূর্বে আমার পোষা কাকাতুয়াটি বাড়ির লোকের অসতর্কতার সুযোগে উড়িয়া যায়। পাখিটি আমার অত্যন্ত আদরের। বহু জায়গায় অনুসন্ধান করিয়া এতকাল তাহার কোনো খবর পাই নাই। সম্প্রতি জানিতে পারিলাম, ঐ কাকাতুয়াটিকে আপনি কোনো পাখিওলার কাছ হইতে কিনিয়াছেন। এখন আপনার নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ, দয়া করিয়া কাকাতুয়াটি আমার হাতে প্রত্যর্পণ করুন। আপনি টাকা খরচ করিয়া কিনিয়াছেন, তাই আপনার অর্থক্ষতি হউক ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। পত্রবাহকের সঙ্গে টাকা আছে। ন্যায্য দাম লইয়া আপনি পাখিটি তাহার হস্তে দিলেই হইবে। পত্রবাহকটি জন্ম হইতেই মূক ও বধির। তাহার সহিত বাক্যালাপ করা নিষ্প্রয়োজন। কিছু জানিবার থাকিলে আপনি তাহার হাতে পত্রও দিতে পারেন। আমার প্রীতি ও নমস্কার জানিবেন। ইতি ভবদীয় শ্রীশচীলাল শরমা।

চিঠি পড়ার পরও উদ্ধববাবু ভ্রূকুঁচকেই ছিলেন। তিনি উকিল মানুষ, সুতরাং একটু সন্দেহবাতিক আছে। কোনো ঘটনাকেই সরলভাবে বিশ্বাস করেন না, যুক্তি দিয়ে সম্ভাব্যতা দিয়ে বিচার করে দেখেন। তিনি একটি চিরকুটে লিখলেন :

মাননীয় শচীলালবাবু,

আপনার পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। আমার ক্রীত কাকাতুয়াটি সাতিশয় অবাধ্য ও জেদি। আজ পর্যন্ত তাহাকে মনোমত বুলি শিখাইতে পারি নাই। পাখিটি যদি আপনার হয় তবে ফেরত দিতেও বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিব না, তবে দুনিয়ায় লক্ষ-লক্ষ কাকাতুয়া আছে। এই অঞ্চলেই কয়েকশো লোকের পোষা কাকাতুয়া আছে বলিয়া জানি। এখন আমার ক্রীত কাকাতুয়াটিই যে আপনার নিরুদ্দিষ্ট কাকাতুয়া, তাহার প্রমাণ কী? যদি অকাট্য প্রমাণ দেন, তাহা হইলেই বুঝিব যে, আপনার নিরুদ্দিষ্ট এবং আমার ক্রীত কাকাতুয়াটি এক ও অভিন্ন। পাখিটি কিনিতে আমার দুইশত টাকা খরচ পড়িয়াছে। মাসখানেক

তাহার খোরাকিবাবদ খরচ হইয়াছে প্রায় পঞ্চাশ টাকা। কাকাতুয়াটি বেশ ভালমন্দ খাইতে পছন্দ করে। প্রীতি ও নমস্কার জানিবেন। ইতি ভবদীয় উদ্ধবচন্দ্র ভট্টাচার্য।

পেয়াদার হাত দিয়ে চিরকুটটা পাঠিয়ে উদ্ধববাবু আবার মোকদ্দমার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঘটনাটা আর মনেই রইল না।

উদ্ধববাবুর বাড়ির সব কাজের কাজি হল নয়নকাজল। ছেলেবেলা থেকেই এ বাড়িতে আছে। ঘরের সব কাজ জানে। এমন-কী, মোকদ্দমার ব্যাপারে উদ্ধববাবুকেও নাকি কখনো-সখনো পরামর্শ দেয়। বয়স বেশি নয়, চল্লিশের নীচেই। তবে তার চালচলন বুড়ো মানুষের মতো ভারিক্কি। আরো ভারিক্কি হওয়ার জন্য সে চোখে একটা চশমা পরে।

দুপুরে কাকাতুয়াটাকে ঝাঁঝরি দিয়ে ভাল করে স্নান করাল নয়ন। বাইরের বারান্দায় শীতের রোদে দাঁড়টা ঝুলিয়ে দিল। তারপর চোখে চশমা এঁটে খবরের কাগজ খুলে পড়তে বসল। ঠিক এমন সময় বিশাল এক সাধু এসে হাজির। পরনে বাঘছাল, হাতে ত্রিশূল, ডমরু, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, মাথায় জটা, বিশাল ভুঁড়ি, পেল্লায় দাড়ি গোঁফ, হুহুংকার দিল, 'হর হর ব্যোম ব্যোম...। হর হর ব্যোম ব্যোম...হর হর ব্যোম ব্যোম..."

সেই হুংকারে আঁতকে উঠল নয়ন। এ শহরটা ছোটো বলে সাধু ভিখিরি সবই সকলের চেনা। কিন্তু এই বিকট সাধুকে আগে কখনো দেখা যায়নি।

চশমার ভিতর দিয়ে (যদিও চশমার কাচে কোনো পাওয়ার নেই) খুব গম্ভীর ভাবে সাধুকে লক্ষ করে নয়ন বলল, "কোত্থেকে আসা হচ্ছে?"

সাধু কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে বারান্দার সিঁড়িতে জমিয়ে বসে বলে, "সোজা হিমালয় থেকে। দেড় হাজার মাইল হাঁটাপথ। ওফ, একটু জল খাওয়াও তো বাপু মায়াবন্ধ জীব।"

'মায়াবন্ধ জীব' বলে এ পর্যন্ত কেউ সম্বোধন করেনি নয়নকে। সে খানিকটা থতমত খেয়ে বলে, "শুধু জল?"

সাধু হা-হা করে আকাশ ফাটিয়ে হেসে ওঠে হঠাৎ। বলে, "আরে জলই তো হাতের গুণে অমৃত হয়ে যাবে। আনো দেখি ঘটিভর।"

সেই হাসি শুনে নয়নের খুব ভক্তি হল। তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল নিয়ে এল সে।

সাধু দু'হাতে ঘটি ধরে উঁচু থেকে গড়গড় করে জল ঢালল গলায়। ঘাবুত-ঘুবুত করে খানিক গিলে ঘটিটা ফেরত দিয়ে বলল, "নে, পেসাদ খা।"

নয়ন ঘটিটা মাথায় ঠেকিয়ে সেটা আলগা রেখে গলায় জল ঢেলেই চমকে ওঠে। জল কোথায়? এ যে খাঁটি কমলালেবুর রস!

ঘটি রেখে নয়ন উপুড় হয়ে সাধুকে প্রণাম করে বলল, "আমাকে দয়া করতে হবে, বাবা।"

সাধু তার মাথায় প্রকান্ড হাতের একটা থাবড়া মেরে বলে, "হবে, হবে। এই যে সিকি ঘটি অমৃত খেলি, এর ঠেলাটাই আগে সামলা।"

নয়নকাজল অবাক হয়ে বলল, "এই কি অমৃত, বাবা?"

"তাহলে কী?" সাধু কটমট করে তাকিয়ে বলে।

আমতা-আমতা করে নয়ন বলে, "না, অমৃতই হবে। খাওয়ার পর থেকে গায়ে একটু জোরও পাচ্ছি যেন। তবে কিনা খেতে একেবারে কমলালেবুর রসের মতো।"

"দূর বেটা খন্ডিত সত্তা, তোরা হলি সংসার-পুকুরের মাছ। অমৃতের স্বাদ কি একবারে পাবি? তবু তো তোর কমলালেবুর রস বলে মনে হয়েছে, অনেকের আবার ডাবের জল বা এমনি জল বলে মনে হয়েছে। তারা ঘোর পাপী, ঘোর পাপী, ব্যোম ব্যোম হর হর..."

নয়ন আর একবার সাধুকে প্রণাম করে।

সাধু কাকাতুয়ার দাঁড়টার দিকে তাকিয়ে ফোঁত করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "নিজেরা হাজারো মায়ায় আটকে ছটফট করছিস, তার ওপর ঐ অবোলা জীবটার পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিস! ঘোর নরকে যাবি যে!"

"আমি নই বাবা! ও হল কর্তাবাবুর পাখি। আমি সামান্য চাকর।"

"যে বেটা নিজেকে চাকর ভাবে, সে তো আগাপাশতলা চাকরই। নিজেকে চাকর ভাবিস কেন? তুই তো মুক্ত আত্মা। এ-বাড়ি

এ-সংসার এ-দুনিয়ার সব কিছুর মালিক। যা বেটা, ছেড়ে দে পাখিটাকে। যা যা, ওঠ, দেরি করিসনি।"

নয়ন ভয়ে-ভয়ে উঠে পড়ে বলে, "কিন্তু বাবা, কর্তাবাবু রাগী লোক। ফিরে এসে পাখি না দেখলে এমন কুরুক্ষেত্র করবে!"

চোখ পাকিয়ে সাধু হুহুংকার দিয়ে ওঠে, "হর হর ব্যোম ব্যোম...কে তোর কেশাগ্র স্পর্শ করবে রে বেটা? এইমাত্র অমৃত খেলি যে! যা বেটা, ছেড়ে দে, একটা মুক্ত আকাশের জীবকে আর কষ্ট দিসনে। ছেড়ে দে, উড়ে যাক।"

নয়নকাজল সাধুর হুংকারে মনস্থির করতে না-পেরে দোনোমোনো হয়ে উঠে পড়ল। দাঁড়ের কাছে গিয়ে শিকলিটা খুলতে সবে হাত বাড়িয়েছে এমন সময় আর-একটা লোক বারান্দায় উঠে বিকট গলায় বলে উঠল, "কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি, খ্যাঁকশিয়ালি পালায় ছুটি...।"

নয়নকাজল এই দু নম্বর চেঁচানিতে ঘাবড়ে গেল। শিকল আর খোলা হল না। তাকিয়ে দেখল, মূর্তিমান গবা পাগলা।

গবা খুব সরু চোখ করে আপাদমস্তক সাধুকে দেখে নিচ্ছিল। ভাল করে দেখে-টেখে বলল, "সব ঠিক আছে। তবে বাবু, তোমার একটা ভুল হয়েছে। গায়ে ছাই মাখোনি।"

সাধু একটু হতভম্ব। কথা সরছে না। তবু একবার রণহুংকার দিল, "হর হর ব্যোম ব্যোম..."

গবা সেই হুংকারে একটুও না ঘাবড়ে বলে, "পায়ে বাটা কোম্পানির চটি জোড়াও মানায়নি একদম। একজোড়া কাঠের খড়ম যোগাড় করতে পারেনি হে?"

সাধু এবার একটু ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, "হর হর..."

গবা সাধুর বাঁ হাতটা তুলে কবজিটা দেখে নিয়ে বলে, "এ যে ঘড়ি পরার স্পষ্ট দাগ গো! রোজ ঘড়ি পরো বুঝি হাতে? সাধুরা আজকাল ঘড়িও পরছে তাহলে! তা সেটা রেখে এলে কোথায়?"

সাধু ত্রিশূলটা শক্ত করে চেপে ধরে ধমক দেয়, "ব্যোম ব্যোম..."

গবা ফিক করে হেসে বলে, "বোমা কেন? পিস্তল নেই? বোমার চেয়ে পিস্তল ভাল। বোমা অনেক সময় ঝোলার মধ্যে ফেটে টেটে

বেতে পারে।"

সাধু এক ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "ঘোর পাপী, ঘোর পাপী। অন্ধকারে ডুবে আছিস।"

পাখিটা অনেকক্ষণ ধরে সাধুকে ঘাড় কাত করে করে দেখছিল আর দাঁড়ে এধার-ওধার করছিল। এখন একটা ডিগবাজি খেয়ে বলল, "বিশু, বিশু, আমার কেন ঘুম পাচ্ছে! ঘুম পাচ্ছে! আলমারিতে টাকা নেই। টাকা আছে..."

সাধু হঠাৎ একটা লাফ মেরে বারান্দায় উঠে দাঁড়টাকে একটা ঝাঁকুনি মেরে বলে, "বল্ বেটা কোথায় আছে! বল্। নইলে গলা টিপে খুন করে ফেলব।"

পাখিটা হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে বুলি ভুলে ডানা ঝাপটে ভয়ের চিৎকার করতে লাগল।

(ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

"মা বলতো আমি গালে কি লাগিয়েছি ?"

"ঠিক বলেছ ! বোরোলীন ! তুমি বলো বোরোলীন লাগালে গায়ের চামড়া ভালো থাকে। তাইতো আমি মুখে, হাতে, পায়ে লাগিয়েছি। এবার আমাকে একটা হামু দাও।"

ছোটদের ত্বকের সুরক্ষার জন্য
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

সাধারণ কাটা-ছড়ার জন্য
একটি কার্যকরী অ্যান্টিসেপটিক

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আশা মহল কলকাতা ৭০০ ০৫৩

HTC-GDP-3760

শিশিরকুমার বসু

॥ ১৫ ॥

১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ইউরোপ যাত্রা করবার আগে দাদাভাই, মা-জননীর সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর দেখা হল না। মা যখন দিল্লিতে ইংরেজি হোম মেম্বারের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলছিলেন, তখনই বোঝা গিয়েছিল যে, সরকারের মনোভাব খুবই কঠোর। যাত্রার আগে কিছুদিনের জন্য কেবল তারা রাঙাকাকাবাবুকে বাবার কাছে জব্বলপুর সেণ্ট্রাল জেলে এনে রাখতে রাজি হল। তাঁকে দেখতে দল বেঁধে আমরা জব্বলপুর গিয়েছিলাম আগেই বলেছি।

বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে জেলে দেখা করবার সময় আমাদের নানারকম অভিজ্ঞতা হত। প্রথমত, দুজনেই রাজবন্দী-দের অধিকার সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। যাঁরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন, সরকারি বা জেলের কর্মচারীরা তাঁদের সঙ্গে যথোচিত ব্যবহার করছেন কী না! না করলে তুমুল গোলমাল শুরু হত। যেমন হয়তো পরিবারবর্গের 'বডি-সার্চ' করার আদেশ হল। এরকম ক্ষেত্রে বিশেষ করে মহিলাদের বেলায়, বাবা ও রাঙাকাকাবাবু তো দেখা করতেই অস্বীকার করতেন। এমন ঘটনা আমাদের ক্ষেত্রে পরে ঘটেছে। কিন্তু জেলের নিয়ম অনুযায়ী দেখা করবার সময় পুলিসের লোকও উপস্থিত থাকবেই। সব কথা তো তাদের সামনে বলা সম্ভব নয়। তাদের চোখে ধুলো দেবার নানারকম উপায় বাবা ও রাঙা-কাকাবাবু বের করতেন। যেমন, জব্বলপুর জেলে তাঁদের ব্যারাকের মধ্যে পার্টিশন দিয়ে পুজোর ঘর করেছিলেন। তাঁরা আমাদের, বিশেষ করে মা বা বাড়ির মহিলাদের, পুজোর ঘর দেখাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন এবং চাইতেন আমরা যেন ইণ্টারভিউ শেষ হবার আগে অতি অবশ্য পুজোর ঘর দর্শন করে যাই। ঠাকুরের আসনের নীচে গোপনীয় কাগজপত্র লুকনো থাকত। মা বা বাড়ির অন্য কোনও মহিলা সেগুলি সংগ্রহ করে লুকিয়ে বাইরে নিয়ে আসতেন।

রাঙাকাকাবাবু আবার আমাদের মতো 'অতিথি'দের জন্য নানারকম জলখাবারের আয়োজন করতেন। জেল-কর্তৃপক্ষের কাছে এর জন্য অতিরিক্ত রেশন দাবি করতেন। তাঁদের সঙ্গে যে-সব সাধারণ কয়েদি থাকত, তাদের মধ্যে দু-একজনের উপর রান্নার ভার দেওয়া হত এবং তারা রাঙাকাকাবাবুর নির্দেশমতো নানারকম খাদ্যদ্রব্য তৈরি করত। তবে আর যাই হোক, আমার মনে হয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রান্নার ব্যাপারে বিশেষ পটু ছিলেন না। চপের মাংস প্রায়ই আধসিদ্ধ থেকে যেত, সন্দেশ বলে যা আমাদের পরি-বেশন করতেন তা প্রায় হত পাথরের মতো শক্ত।

রাঙাকাকাবাবুর জন্য জব্বলপুর জেলের মধ্যেই তাড়াহুড়ো করে ইউরোপের উপযোগী গরম জামা-কাপড়, টুপি, জুতো ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হল। পুলিস-পাহারায় দর্জি ও জুতো বানাবার লোককে হাজির করা হল। ইউরোপ গিয়ে রাঙাকাকাবাবু কী ধরনের পোশাক ব্যবহার করবেন, সে বিষয়ে তাঁর নির্দিষ্ট মতামত ছিল। কোনো সরকারি বা বেসরকারি অনুষ্ঠানে বা কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করবার সময় ভারতীয় পোশাক পরাটাই তিনি উচিত মনে করতেন। আমার মনে হয়, তিনি এইভাবে একটি সর্বজন-গ্রাহ্য ও সর্বভারতীয় পোশাক উদ্ভাবনের চেষ্টায় ছিলেন। লম্বা আচকান, কাশ্মীরি টুপির সঙ্গে তিনি ইউরোপীয় প্যাণ্ট ও ফিতে-বাঁধা জুতো মিলিয়ে পরতেন—এই পোশাকে তাঁর বহু ছবিও আছে। একটা কথা তাঁকে ইউরোপ থেকে ঘুরে আসার পরে বলতে শুনেছি। ইউরোপে চুড়িদার পায়জামা

এই দেখ, আমার
জন্মদিনের উপহার

ইউকোব্যাঙ্ক-এর
পাসবই

ভারী মজার। এই একটা উপহার
আমাকে বছর বছর উপহার এনে দেবে।
ইউকোব্যাঙ্ক পাস বইয়ের মজাই তো
এখানে।
ভাগ্যিস্ আমার মাথায় বুদ্ধিটা এসেছিল।
অবশ্য ইউকোব্যাঙ্ককেও ধন্যবাদ
দিই—আমার জমা পয়সা বছর
বছর বাড়িয়ে তোলার জন্যে।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান।

UCO CAS-69.80 BEN

পরা সম্বন্ধে তাঁর আপত্তি ছিল। কারণ, ঐ ধরনের পায়জামা ইউরোপে 'আণ্ডার-ওয়েয়ার'এর পর্যায়ে পড়ে এবং তিনি শুনেছেন সেখানকার সমাজে চুড়িদার পায়জামা-পরা কোনো-কোনো ভারতীয়কে অসুবিধা-জনক অবস্থায় পড়তে হয়েছে। অবশ্য রাঙা-কাকাবাবু পরে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পুরো-পুরি ইউরোপীয় পোশাক আনুষ্ঠানিকভাবেও পরেছেন। তবে, পোশাক যাই হোক না কেন, বিদেশে গিয়ে ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারে যাতে কোনোরকম খুঁত না থাকে সে-বিষয়ে তিনি খুব সজাগ থাকতেন। তিনি বলতেন, বিদেশে গেলেই পোশাক-আশাক, আচার-ব্যবহার খুবই রুচিসম্মত হওয়া চাই। কারণ, সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, আমরা অন্য দেশে কোনো না কোনো ভাবে আমাদের মহান দেশের প্রতিনিধিত্ব করছি। আমরা ব্যক্তিগত-ভাবে কী রকম আচার-ব্যবহার করি, তার উপর আমাদের দেশের সুনাম নির্ভর করছে।

জব্বলপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে কড়া পুলিস পাহারায় অ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে সরকারি কর্মচারীরা রাঙাকাকাবাবুকে স্টেশনে নিয়ে গেল এবং স্ট্রেচারে করে বোম্বাই মেলে তাঁর নির্দিষ্ট কামরায় তুলে দিল। খবরটি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় স্টেশনে বেশ ভিড় হয়েছিল। বাড়ির যারা জব্বলপুর গিয়েছিলাম, প্রায় সকলেই তাঁকে বিদায় জানাবার জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলাম।

তাঁর জাহাজ বোম্বাই ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়নি।

জব্বলপুর জেলে বাবা একলা পড়ে গেলেন। তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়তে লাগল। বাবার স্বাস্থ্য ও পারিবারিক সমস্যা নিয়ে সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা ও লেখালেখি আরম্ভ হল। আমাদের পরিবারের দুই বন্ধু প্রভাসচন্দ্র বসু ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এবং মামা অজিতকুমার দে উঠে পড়ে লাগলেন। বাবার গ্রেফতারের পর দিল্লির সেণ্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে বিরোধীপক্ষ থেকে মাঝে মাঝে নানারকম প্রশ্ন তোলা হত। ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে একবার হোম মেম্বার চক্ষু রক্তবর্ণ করে বলে বসলেন, "গভর্নমেণ্ট হ্যাভ রিসনস টু বিলিভ দ্যাট হি ইজ ডিপলি ইনভল্‌ভড ইন দি টেররিস্ট মুভমেণ্ট।" (সরকারের বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।) সুতরাং সরকার বাবাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনবার প্রস্তাব বিবেচনা করতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। অনেক চেষ্টার পর, বাবার স্বাস্থ্য যখন সত্যিই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তারা বাবার কাশিয়াংয়ের বাড়িতে তাঁকে বন্দী করে রাখতে রাজি

কাশিয়াংয়ে নিজের বাড়িতে বন্দী অবস্থায় শরৎচন্দ্র—১৯৩৪। (লেখকের তোলা ফোটো)

হল।

নিজের বাড়িতে পাহারাওয়ালা-বেষ্টিত হয়ে বন্দী হয়ে থাকাটা একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। বাবা পথ দেখালেন। পরে ১৯৩৬-এ রাঙাকাকাবাবুও একই ভাবে কার্শিয়াংয়ে আমাদের বাড়িতে বন্দীজীবন যাপন করেন।

রাঙাকাকাবাবু ইউরোপ চলে যাবার পরে ও বাবা কার্শিয়াংয়ে স্থানান্তরিত হবার পরে মা আমাকে নিয়ে পুরীতে দাদাভাই ও মা-জননীর সঙ্গে দেখা করতে যান। মায়ের উদ্দেশ্য ছিল দাদাভাইকে অবস্থাটা পুরো-পুরি বুঝিয়ে বলা। মা যে দিল্লিতে নিজে দরবার করেও ইউরোপ যাবার আগে রাঙা-কাকাবাবুর সঙ্গে দাদাভাই ও মা-জননীর দেখা করার ব্যবস্থা করতে পারেননি, সেজন্য মায়ের গভীর দুঃখ ছিল। ফলে দাদাভাই-য়ের সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর আর জীবনে দেখা হয়নি। মাকে সান্ত্বনা দিয়ে দাদাভাই সেই সময় বলেছিলেন, "তোমাকে তো আমি আমার 'মা-জননী' বলেই এতদিন জানতাম, দুঃখ কোরো না, তুমি তো আজ আমার ছেলের কাজ করলে।"

পুরী থেকে ফিরে মায়ের সঙ্গে আমরা সকলে ছুটির সময় সরকারের অনুমতি নিয়ে বাবার কাছে আমাদের গিধাপাহাড়ের বাড়িতে থাকতে গেলাম। বাড়িটি কার্শিয়াং শহর থেকে বেশ কিছু দূরে এবং মোটরের রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা ওপরে। দিনরাত রাইফেলধারী ডবল-ডবল সিপাই বাড়িটি পাহারা দিত। তা ছাড়া আমাদের সন্দেহ হত যে, আরও জনাকয়েক স্থানীয় বাসিন্দাকেও কিছু পারি-শ্রমিক দিয়ে পুলিস তাদের কাজে লাগাত। কার্শিয়াং থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সবসময় কড়া নজর রাখতেন। দার্জিলিংয়ের ইংরেজ ডেপুটি কমিশনারও নিয়মিত এসে সব ব্যবস্থা দেখে যেতেন। বাবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন সিভিল-সার্জন মেজর এস বি মুখার্জি। মেজর মুখার্জির মতো নিষ্ঠাবান ভদ্রলোক কমই দেখেছি। সরকারি কাজ করতে এসে বাবার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাঁর পরি-বারের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা বহুদিন অব্যাহত ছিল। পরে মেজর মুখার্জির অকস্মাৎ মৃত্যুতে বাবা ভ্রাতৃবিয়োগের ব্যথা পেয়েছিলেন এবং তাঁর পরিবারের কষ্ট লাঘব করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

স্বাস্থ্যের কারণে সরকার বাবাকে পুলিস পাহারায় বিকেলে হিলকার্ট রোডে ওপরের দিকে এক মাইল ও নীচের দিকে এক মাইল বেড়াতে দিত। আমরাও বাবার সঙ্গে বেড়াতাম। মাঝে-মাঝে বেড়াবার সময় রাস্তায় অঘটন ঘটে যাবার উপক্রম হত। যাঁরা দার্জিলিং বা ঐ অঞ্চলে বেড়াতে যেতেন, তাঁদের ঐ রাস্তা দিয়েই যেতে হত। বাবাকে দেখতে পেয়ে অনেকে উত্তেজিত হয়ে গাড়ি থামিয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করতেন। পেছনেই তো পুলিস। বাবা মুখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন কথা বলা বারণ।

গ্রেফতার, খানাতল্লাশি, নির্বাসন সম্বন্ধে তো কত কথা বললাম। একটা কথা এই সূত্রে না বলে পারছি না। আজকালকার ছেলে-মেয়েরা এসপ্ল্যানেডে যে মাঝে-মাঝে গ্রেফতার-গ্রেফতার খেলা দেখে, এখানে-ওখানে রিলে-অনশন, চব্বিশ ঘণ্টার অনশনের গল্প শোনে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমরা কিন্তু এ ধরনের ফাঁকি দিয়ে দেশ উদ্ধারের প্রহসনের সাক্ষী ছিলাম না। গ্রেফতার বা খানাতল্লাশি বা অনশন ছিল অতি গুরুতর ও সর্বনাশা ব্যাপার। ব্যক্তির পক্ষে তো বটেই, বহু পরি-বারেরও ক্ষেত্রেও। বিশেষ করে সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু ও বাংলার বিপ্লবীরা সংগ্রামের এসব হাতিয়ার কখনও ফাঁকা লোক-দেখানো তামাশার মতো ব্যবহার করতেন না। যখন পুরনো দিনের কথা লিখি, তখন ভাবি, কবে আবার অকৃত্রিম দেশ-প্রেম ও আদর্শবাদের ঢেউ বাংলা তথা ভারত-বর্ষকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে! (ক্রমশ)

নয়নচাঁদের বাড়িতে ডাকাত

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

না, এ যুগের মানুষ নন নয়নচাঁদ। কোম্পানির আমলের।

তখন শহরের চেহারা ঠিক এরকম ছিল না। অনেক পতিত জমি, ঝোপ-জঙ্গল আর খানা ডোবায় ভরা ছিল এ শহর। রাস্তা ছিল ধুলোয় ভরা। সন্ধে হতে-না-হতে ঝুপ করে নামত অন্ধকার। তখন পথে বেরোতে কারো সাহস হত না। থেকে থেকে শেয়াল ডাকত। আর চৌরঙ্গির দিক থেকে বাঘের গর্জনও শোনা যেত। তবে তার থেকেও যা ভয়ঙ্কর ছিল, সে হল ডাকাত পড়া। হঠাৎ আঁধার ফুঁড়ে মশাল হাতে পিল পিল করে বেরিয়ে আসত কালো কালো লোক। ঝাঁপিয়ে পড়ত গেরস্থের বাড়ির উপর। তাদের 'হারে—রে—' চিৎকারে কেঁপে কেঁপে উঠত গ্রামগঞ্জ। শিউরে উঠত শহর।

কলকাতাও কাঁপত।

মল্লিকদের মাথা ছিলেন নয়নচাঁদ। শহরের পাঁচ-সাতজন বড়লোকের ভেতর তিনিও একজন। এক ডাকে সবাই ওঁকে চেনে। ব্যবসাদার। সাতপুরুষের ব্যবসা। তবে এ শহরে সবে দুই পুরুষ। অর্থাৎ বাপের আমল থেকে। বাবা দেহ রাখলেন পলাশির যুদ্ধের সতেরো বছর আগে। বাবার নাম ছিল দর্পনারায়ণ। দাপটও ছিল। সেই দাপট এবং সব বিষয়-আশয় একমাত্র ছেলেকে দিয়ে গেলেন বাবা। নয়নচাঁদের বয়স তখন সবে সাতাশ।

বয়স একটু কম হলে কী হয়, নয়নচাঁদ তুখোড় ব্যবসাদার। দিনে দিনে বৈভব বাড়িয়েই চলেছেন।

গঙ্গার ধারেই মল্লিকমশায়ের আড়ত। গদি-গুদাম সবই এক জায়গায়। সামনেই ওঁর নিজস্ব ঘাট। নয়নমল্লিকের ঘাট। অবিরাম নৌকো যাতায়াত করছে। ওঠানামা করছে মালপত্তর। সেরেস্তার কর্মচারীরা হিসেব-নিকেশ করতে হিমসিম খাচ্ছে।

দেশ-দেশান্তর থেকে আসছেন সওদাগরেরা। এঁদের দেখাশোনা করতে নানা রকমের কর্মচারী রাখা হয়েছে। কেউ মুসলমান। কেউ ফিরিঙ্গি। আবার কেউ বা পর্তুগিজ।

নয়নমল্লিক গড়গড়ায় টান দিতে দিতে সব দিকে নজর রাখছেন আর নতুন কোনো লোক দেখলেই হাসিমুখে অ্যাপ্যায়ন করছেন। এরই ফাঁকে ডাক-হরকরা এসে চিঠি দিয়ে গেল।

অনেক চিঠি। মুনশি এসে চিঠিগুলি

একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরঙ্গ—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল...
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!

লিরিল
তরতাজা হবার সাবান

লেবুর মত চনমনে তরতাজা

লিনটাস-LR.28-203 BG

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

খুলে মল্লিকমশাইকে শোনাতে বসলেন। আর কোথায় কী উত্তর লিখতে হবে, তার নির্দেশ লিখে নিতে থাকলেন।

হঠাৎ হাত কেঁপে উঠল। একটি চিঠি হাতে নিয়ে মুনশি ঠকঠক করে কাঁপতে আরম্ভ করলেন। নয়নচাঁদ শটকায় টান দিয়ে বললেন, "কী হল, মুনশি, আপনার মৃগী রোগ হল না কী!"

প্রথমে কথা বেরোয় না। পরে অস্ফুট স্বরে মুনশি তোতলাতে তোতলাতে বললেন, "রোঘো ডাকাত।"

"রোঘো! সে আবার কোথা থেকে এল?"

"আজ্ঞে, চিঠি লিখেছে। লিখেছে, আজ রাত্তিরে—রাত-দুপুরে সে আপনার বাড়িতে অতিথি হবে।"

হা-হা করে হেসে উঠলেন নয়ন মল্লিক। "এ তো খুব ভাল কথা মুনশি। রোঘো আসবে, তাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা জানাতে হবে। এতে ভয়ের কী!"

দেখতে দেখতে খবরটি ছড়িয়ে পড়ল। ভয়ে সকলের মুখ গেল শুকিয়ে। রোঘো যে কে এবং কী জন্যে আসে, তা কারো অজানা ছিল না। সাহেবরা পর্যন্ত তাকে ভয় খায়। দারোগা-পুলিস ভির্মি খায় রোঘোর নামে। সুতরাং তাকে ভয় খাবে না তো খাবে কাকে?

কোথায় রঘুর বাস, সেটি পর্যন্ত কেউ ঠিক করে বলতে পারত না। কেউ বলত নদীয়া জেলায়, কেউ বলত হুগলি, কেউ বলত চন্দননগর। গভর্নমেণ্ট থেকে রঘুকে ধরবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তাকে ধরে কার সাধ্যি! হাতে তার লম্বা লাঠি। আর সঙ্গে একদল শিকারি। তাদের হাতে তলোয়ার ও ঢাল। বল্লম। সড়কি।

রঘু যদি কোথাও যাব বলে, নিশ্চিত-ভাবে সে যাবে। তাকে আটকাবার ক্ষমতা কারো নেই। নৈহাটির দারোগা দুর্গাচরণ বা কদমগাছির পুলিস অফিসার শিব বাঁড়ুজ্যে অনেক চেষ্টা করেও রঘুকে আটকাতে পারেননি। ওঁদের দুজনের সঙ্গেই ডাকাত-মশাই এসে আলাপ করে গেছেন। তবে ছদ্মবেশে। একবার জেলে সেজে বাবুদের মাছও খাইয়ে গিয়েছিলেন।

একবার এক জমিদারকে রঘু চিঠি লিখল, "আমি যাচ্ছি।"

জমিদার পুলিসি ব্যবস্থা নিলেন। বাড়ির চারদিকে পাহারা বসল। আজেবাজে লোক ঢুকতে দেওয়া হয় না। বুঝেসুঝে এক আধজন ভদ্রলোককে ছাড়া হয়। কী আশ্চর্য, ঐ ফাঁকেই রোঘো ঢুকে গেল। মাথায় বাবরি চুল। মসলিনের ফতুয়া। তার ভেতরে চিক-চিক করছে সোনার হার। ফিটন গাড়ি হাঁকিয়ে বাবু এলেন। না, বোঝাই গেল না রঘুকে।

রঘু এসে অন্ধিসন্ধি দেখে গেল। তার-পর এক গভীর রাতে পাহারাদাররা যখন ঘুমে ঢুলু-ঢুলু, শিকারি সঙ্গীদের নিয়ে, রক্ষীদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে, জমিদারবাবুর শোবার ঘরে হানা দিল রঘু। নিমেষে কাজ-কর্ম সমাধা হয়ে গেল। রঘুকে আটকায় কার সাধ্যি? যারা রঘুকে হত্যার চক্রান্ত করেছে, তাদের ছিন্ন মুণ্ড গড়াগড়ি গেছে। রঘু সেখানে ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাপরায়ণ। এ ব্যাপারে তার কোনো ক্ষমা নেই। সে নির্মম। নিষ্ঠুর।

সেই রঘু আজ রাতে আসবে। আসবে অতিথি হয়ে!

নয়নচাঁদ মল্লিকের বাড়িতে ভয়ের ছায়া নামল। বাড়ির ছেলে-বুড়ো সবাই কাঁপতে থাকল। কাঁপতে থাকল কর্মচারীরা। বাড়ির ভোজপুরি দরোয়ানেরা অবশ্য লাঠি ঠুকে গোঁফে তা দিতে থাকল; কিন্তু নয়নচাঁদ কাউকে পাত্তা দিলেন না। তিনি বেশ খুশ মেজাজেই রইলেন এবং যেমন অন্যদিন কাজকর্ম করতেন, সেইভাবেই করতে থাকলেন। এতটুকুও বিচলিত হলেন না। বিকেলের দিকে দেখা গেল আশেপাশে অনেক আত্মীয়-স্বজনকে তিনি রঘুর আগমন উপলক্ষে রাত্তিরে উপস্থিত থাকবার নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। আর ফিস-ফিস করে মল্লিকমশাই খাজাঞ্চীকে বলে দিলেন কয়েকটি টাকার তোড়া তৈরি করে রাখতে।

রাত হল। গভীর রাত। বাড়িতে এবং বাড়ির বাইরে নয়নচাঁদের নির্দেশে রোশনাই জেবলে সকলে অপেক্ষা করতে থাকলেন। দরজায় দারোয়ান। কিন্তু সে আটকাবার জন্য নয়, অভ্যর্থনা জানাবার অপে-

ক্ষায়। বাড়ির মাঝে উঠোন, তার এক প্রান্তে মল্লিকমশাই আসর জমিয়ে বসে আছেন। আত্মীয়-স্বজন, চাকর-বাকর সবাই আছেন তাঁর কাছাকাছি। মেয়েরা বসে আছেন চিকের আড়ালে। একটু পরেই যেন নাটক অভিনীত হবে, সবাই যেন তারই প্রতীক্ষায়।

নয়নচাঁদ মল্লিক গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন আর হাসি-হাসি মুখে সকলের সঙ্গে নানান গল্প করছেন। রঘুর ব্যাপারটি যেন কিছুই নয়, এরকম একটি ভাব। আর সবাই কিন্তু ভয়ে কাঁপছে। বুক দুরু-দুরু। সুযোগ থাকলে পালিয়ে যেতেন। কেবল মল্লিক-মশায়ের জন্য পালাতে পারছেন না। তবে কৌতূহলও দুর্বার। দেখা যাক না মল্লিক-মশায়ের সঙ্গে রঘুর মোলাকাতটা কেমন হয়।

নিষুতি রাত। ঢিলেশ্বরীর মন্দিরের পিছনের জঙ্গল থেকে হঠাৎ একদল শেয়াল ডেকে উঠল। শোনা গেল কয়েকটি নিশাচর পাখির ডাক।

আর ঠিক সেই সময়েই চকমিলান বাড়ির উঠোন ফুঁড়ে লেঠেলদের নিয়ে মল্লিক মশায়ের সামনে নাটকীয়ভাবে উঠে দাঁড়াল রঘু ডাকাত। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। হাতে লম্বা লাঠি। ইয়া চওড়া গোঁফ। তাকে দেখে অনেকেরই দাঁতে দাঁত লেগে গেল।

নয়নচাঁদ মল্লিক মুখ থেকে শটকাটি সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে, রঘু এলি?"

"জি হাঁ মল্লিকমশাই।"

"তা এত রাত হল কেন বাবা"

"কী জানি, আপনি কী মতলব করেছেন, তা তো জানি না, বাবা, তাই একটু রাত করেই এলাম। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো, আপনি এত রোশনাই জেলে বসে আছেন কেন? আমাকে কি আপনি ভয় খান না। না কি অন্য কোনো মতলব আছে?"

"তা একটু আছে বই-কী," গড়গড়ায় টান দিলেন নয়নচাঁদ মল্লিক। ভুড়ুক-ভুড়ুক শব্দ উঠল। এবং তামাক খেতে খেতেই বললেন, "এই যে এত লোকজন দেখছ এসব জমায়েত আমি তোমার জন্যেই করেছি। শুনেছি তোমার দলে ভাল লাঠিয়াল আছে, পাইক আছে। কথাটি কি ঠিক?"

রঘু সগর্বে বলল, "তা আছে বইকী মল্লিকমশাই। আমার কাছে এই যে লোক রয়েছে, এরা এখনই একহাজার লোকের মহড়া নিতে পারে।"

"তাই নাকি। তাই নাকি।" খুক খুক করে কাসলেন নয়নচাঁদ মল্লিক। তারপর বললেন, "খুব ভাল কথা রঘু। শুনেও আনন্দ। তা বাপু, শুধু শোনা থাকে কেন. চোখের ওপর একটু লাঠিবাজি দেখিয়ে দাও দেখি। চোখের সামনে দেখি তোমার হিম্মত কতখানি।"

হিম্মতের কথা শুনে রঘু গোঁফে চাড়া দিল তারপর মুখ দিয়ে এক অদ্ভূত শব্দ করল। এবং ঐ শব্দ শেষ হতে-না-হতে চারদিকে লেগে গেল খটাখট শব্দ। পুরো আধ ঘণ্টা ধরে চলল এই লাঠির খেলা। মল্লিক-মশায়ের আশেপাশে যাঁরা বসে ছিলেন, এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে তাঁদের লোম উঠল খাড়া হয়ে। অনেকেই কাঁপতে থাকলেন। ব্যাপারটি কোন দিকে গড়াবে, ওঁরা কেউই ঠাহর করতে পারছিলেন না। ফলে, ভয় আরো বেড়ে যাচ্ছিল।

মল্লিকমশাই কিন্তু নির্বিকার। গড়গড়ায় তিনি টান দিয়েই যাচ্ছিলেন। আর এক-মনে দেখছিলেন লাঠি খেলা। খেলা শেষ হল।

নয়নচাঁদ বললেন, "বা! বেশ খেলা দেখালে হে রঘু। ভালই লাগল। তা তোমাকে আমি পুরস্কৃত করতে চাই। দলবল নিয়ে তুমি সামিয়ানার নীচে বোসো।"

রঘু এগিয়ে এসে বলল, "আপনার মতলব ভাল মনে হচ্ছে না মল্লিক মশাই। আপনি ঠিক কী চান বলুন তো?"

"বাঁধতে চাই, তোমাকে এমন বাঁধা বাঁধব যে, পালাবার পথ পাবে না!"

"বটে!" রঘু গোঁফে চাড়া দিল। এদিকে মল্লিকমশাই খাজাঞ্চীকে ইশারা করলেন। সামনেই বাঁধা ছিল ছোট-বড় অনেকগুলি টাকার তোড়া। ডাকাতদলের সকলের হাতে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল ছোট-ছোট তোড়াগুলি। বড়টি তুলে দেওয়া হল রঘুর হাতে। নয়নচাঁদ মল্লিক হাসতে হাসতে বললেন, "কী রঘু, কেমন লাগছে? তোমার লাঠিখেলা দেখে আমি ভারী খুশি হয়েছি, এই তার পুরস্কার। তোমাকে দিলাম পাঁচ হাজার, আর তোমার দলের পাইকদের প্রত্যেককে

পঞ্চাশ।—কী, তুমি খুশি হয়েছ তো?"

রঘুর মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। এমন তাজ্জব ঘটনা সে জীবনে দেখেনি। ডাকাতি করে কখনো সে এতগুলি টাকা একসঙ্গে পায়নি। মল্লিকমশাই এগুলি তাকে দিলেন পুরস্কার হিসাবে! কী তাজ্জব ব্যাপার। মল্লিক মশাই বললেন, "রঘু, তোমাকে আরো একটি কাজ করতে হবে। তোমরা আমার অতিথি। তোমাদের খাবার আয়োজনও আছে। ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করে তারপর বাড়ি ফিরবে!"

রঘু বিব্রত বোধ করল। বার কয়েক গোঁফে হাত বুলোল। এ ভাবে টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাবেন মল্লিকমশাই। তাই সেও হুঙ্কার দিল, "আপনার সব প্রস্তাবে রাজি আছি মল্লিক মশাই। কিন্তু একটি শর্তে—"

"কী সে শর্ত?"

"আজ আপনি যে-ভাবে আমার ওপর খবরদারি করলেন, বাকি জীবনটা আমি আপনার ওপর সেটা করতে চাই।" "বেশ তো, কী রকম করতে চাও বলো," খুশি খুশি মুখে বললেন নয়নচাঁদ মল্লিক।

"আজ্ঞে, আপনার বাড়িতে আর কখনো যাতে ডাকাত না পড়ে তার পাকাপাকি বন্দোবস্ত কবতে চাই। আপনাকে যাতে কেউ অসম্মান করতে না পারে, তাকে ঠেকাবার জন্য আপনার বাড়িতে থাকবে আমার এক শিকারি পাইক। সে পাহারা দেবে।"

"তথাস্তু" নয়নচাঁদ মল্লিক গড়গড়ার শটকা নামিয়ে দু হাত তুলে অভয় বাণী দিলেন, "আজ থেকে রঘু, তুমি আমার বন্ধু।"

সে রাতে এলাহি খাওয়াদাওয়া হল। ভোজ মিটতে মিটতে রাত গড়িয়ে প্রায় ভোর। ঢিলেশ্বরীর মন্দিরের পিছনের জঙ্গল থেকে আবার শিয়াল ডাকল। শেষ প্রহরের ডাক। শহর কলকাতার ইতিহাসে গেরস্থে ডাকাতে এমন প্রীতিভোজ কেউ কখনো দেখেনি, রঘুও এমন ফাঁদে কখনো পড়েনি।

ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতে মল্লিক মশায়ের বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল।

পরের দিন সকালে বাইরের লোকেরা কেউ কিছু বুঝতেই পারলে না। বাড়িতে শুধু একটি নতুন পাইক নিযুক্ত হল, এই যা।

ছবি রতন সেন

ছবির মজা

দমকল লাল হয়, জানো নিশ্চয়। তাই বুঝে রং-পেনসিল দিয়ে ছবিটি রঙিন করো। তার আগে লুকোনো তিনটি হেলমেট খুঁজে নাও।

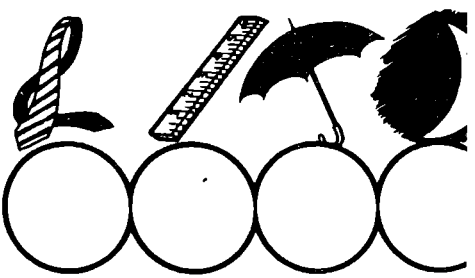

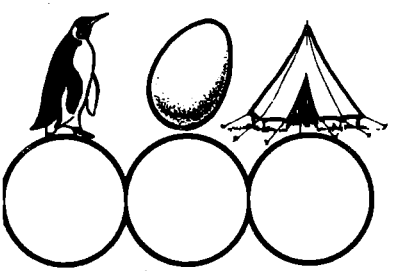

ছবিগুলির বিষয়বস্তুর নাম ইংরেজিতে ভাবো। তারপর প্রতিটি নামের আদ্যক্ষর নীচের বৃত্তে বসাও। সব মিলিয়ে কী পেলে? ট্রাম্পেট।

আসল রাজা

আবুল সালেক

কাকের মুখে রটল খবর
বনের রাজা বাঘ মরেছে।
জন্তুরা সব একে-একে
মরা বাঘটা এল দেখে।
কেউ করল আহা-উহু
কেউ ভাবল, বাঁচা গেছে।

ক'দিন পরে বলল সবাই,
"বাঘ মরেছে, এখন তবে
বনে একটা রাজা তো চাই,
কে তাহলে রাজা হবে?"
শেয়াল শুনে চুপি-চুপি
মাথায় দিয়ে গাধার টুপি
লাফিয়ে উঠে সিংহাসনে
ডাকল হুয়া-হুক্কা রবে।
বলল যে, সেই রাজা হবে।

ভালুক বলল, "এই বেয়াদপ!
ওখান থেকে নাম এখুনি,
'রাজা হব' এসব কথা
ফের যদি তোর মুখে শুনি
একটি চড়ে অক্কা পাবি,
হুক্কা-হুয়া ভুলে যাবি।
বাঘ নেই তো ভালুক আছি,
বাঘের পরেই আমার দাবি।"

নেকড়ে বলল, "দিব্যি আছি,
করবে তুমি ভালুক-নাচও
সিংহাসনে বসে আবার
ভাবছ বুঝি রাজাও হবে?
আমি হলাম বাঘের পিসে
আমার দাবি কমটা কিসে?
আমায় রাজা করতে হবে।"

হায়না বলল, "হাসাস না আর,
পিসি কোথায় ঠিক নেই তার,
উনি এলেন পিসেমশাই!
আমরা কোথায় যাই রে তবে?
আমায় রাজা করতে হবে।"

বাঁদর বলল, "ওরে হায়না
জুড়ে দিলি তুইও বায়না!
জানিস তো কেউ তোকে চায় না,
ভাগাড় দিয়ে নেংচে চলিস,
রাজা হবি তুই-ও বলিস!
আমি বানর, অর্ধেক-নর,
বনবাসী, বুদ্ধিজীবী,
আমায় রাজা করতে হবে,
সব্বাইকে বলে দিবি।"

শুয়োর বলল, "বাঁদরামি রাখ্,
গাছে থাকিস গাছেতেই থাক,
সব বুদ্ধি বেরিয়ে যাবে
পেটটা যখন দেব চিরে।
আমায় বেশি ঘাঁটাসনি রে
ফের ঘাঁটালেই মরতে হবে;
আমি যখন গোঁ ধরেছি
আমায় রাজা করতে হবে।"

সবাই চ্যাঁচায়, গিঁ-অ্যা-ও, গ্যাঁক্-গ্যাঁক্,
গ-র-র, ঘোঁত ঘোঁত, হুপ, খ্যাক্-খ্যাক!
বন তোলপাড় হট্টগোলে।
বাদুড় তখন উঠল বলে,
"ঝুলে-ঝুলে দেখচি সবই,
সবাই ভাবছিস রাজা হবি,
শেয়াল-কে আর দেখচিস কেউ?
শুনতে পাচ্ছিস ডাকছে যে ফেউ!
ভেবেছিলি বাঘ মরেছে,
আরেকটা যে এসে গেছে,
মস্ত জোয়ান, ইয়া থাবা!"
সবাই বলল, "আইরে বাবা!"
কেউ বলল, "পালা পালা!"
কেউ বলে, "আন ফুলের মালা,
এসে গেছেন রাজা মশাই,
সিংহাসনে এনে বসাই,
আমাদের তো রাজা সাজা,
বাঘ হচ্ছেন আসল রাজা।"

রোভার্সের রয়

কিছুদিন যাবৎ রয় গোল পাচ্ছে না। বার্মাথের সঙ্গে খেলাতে পাবে কি ?
সামনে শুধু গোলকীপার !
গোল হবেই !
উঃ !
সে কী- তাও গোল করতে পারল না !
গোল অবশ্য অন্য-একজন পেল···
ভার্নন ঠিক তক্কে-তক্কে ছিল !
গো-ও-ও-ল !
গোলটা কিন্তু তোমারই পাওনা ছিল !
কিন্তু ভার্নন তো পেয়েছে !
সেটাই আসল কথা !
রয় কিন্তু সুন্দর বল জুগিয়ে যাচ্ছে !
এবারে দিয়েছে জেরিকে !
আবার গোল হবে
জেরি দিল মারভিনকে সেখান থেকে চমৎকার পাস···
রয়কে গার্ড দাও !
সবাই রয়কে সামলাচ্ছে !
যাঃ !
উহুঁ !
রয়ের মাথা বল ছোঁয়নি !

বল ম্যাটতে পড়বার আগেই
গো-ও-ও-ল !
জিমি দিবা গোল দিয়েছে !
দু গোল খেয়ে বার্মাথ দিশেহারা ···
আবার এগোচ্ছে রয় !
গোলে কামান দাগো, রয় !
কিন্তু···হায়···
যাঃ !
পোস্টে লেগেছে !
ডানকান প্রস্তুত ছিল···
গো-ও-ও-ল !
আবার গোল !
শাবাশ !
বিরতির সময়···
আজও গোল পাচ্ছি না !
দল তো গোল পাচ্ছে !
এবং সেটা পাচ্ছে তোমারই জন্যে !
তাহলে আর দুঃখ কী ?
ঠিক কথা !
দলের জেনারেল ম্যানেজার বেন গ্যালোয়ে ঘরে ঢুকলেন···
রয়, ইউরোপীয়ান কাপের সেমিফাইনালে কাদের সঙ্গে খেলতে হবে জানো ?
ডোরিনো !
গতবারের চ্যাম্পিয়ন !
ডোরিনোকে হারিয়ে ফাইনালে উঠতে হবে !
দেখা যাক !
গোল না-পেলে ডোরিনোর বিরুদ্ধে আমি নামব না !
এর পরে আগামী সংখ্যায়
রয় কি সত্যি গোল পাবে না ?

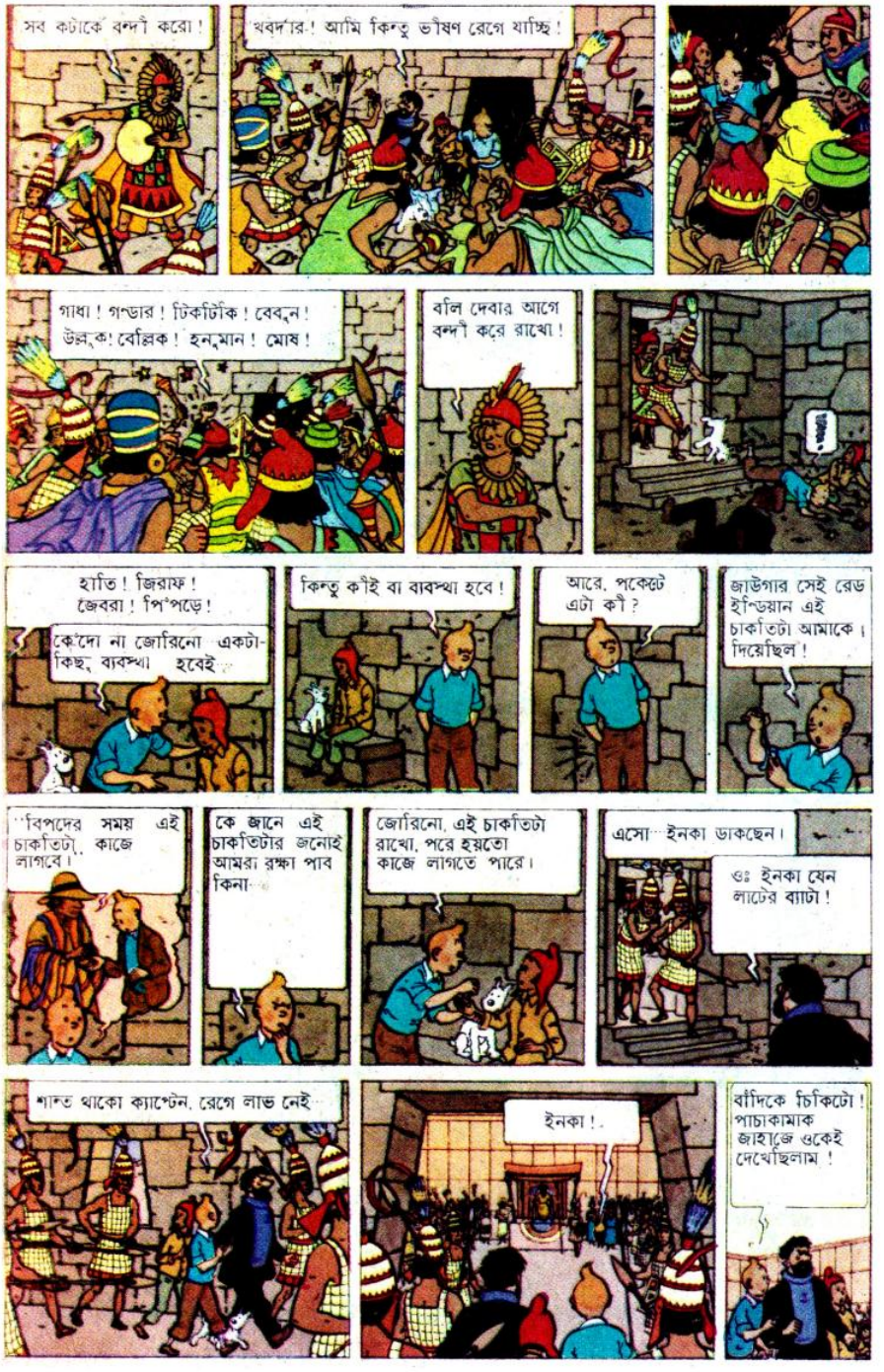

সব কটাকে বন্দী করো!
খবরদার! আমি কিন্তু ভীষণ রেগে যাচ্ছি!
গাধা! গন্ডার! টিকটিকি! বেবুন! উল্লুক! বেল্লিক! হনুমান! মোষ!
বলি দেবার আগে বন্দী করে রাখো!
হাতি! জিরাফ! জেবরা! পিঁপড়ে!
কেঁদো না জোরিনো একটা-কিছু ব্যবস্থা হবেই…
কিন্তু কীই বা ব্যবস্থা হবে!
আরে, পকেটে এটা কী?
জাউগার সেই রেড ইন্ডিয়ান এই চাকতিটা আমাকে দিয়েছিল!
"বিপদের সময় এই চাকতিটা কাজে লাগবে।
কে জানে এই চাকতিটার জন্যেই আমরা রক্ষা পাব কিনা…
জোরিনো, এই চাকতিটা রাখো, পরে হয়তো কাজে লাগতে পারে।
এসো…ইনকা ডাকছেন।
ওঃ ইনকা যেন লাটের ব্যাটা!
শান্ত থাকো ক্যাপ্টেন, রেগে লাভ নেই…
ইনকা!
বাঁদিকে চিকিটো! পাচাকামাক জাহাজে ওকেই দেখেছিলাম!

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

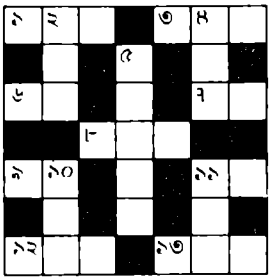

শব্দ-সন্ধান

১	২			৩	৪	
			৫			
৬					৭	
		৮				
৯	১০				১১	
১২				১৩		

সংকেত : পাশাপাশি : ১। সুগন্ধী কাঠ। ৩। জলচর পাখি। ৬। বন্যা। ৭। কীটপতঙ্গের অস্ত্র। ৮। যে-গাছ অনেক হস্তশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ৯। শস্যবিশেষ। ১১। পুচ্ছ। ১২। পাখিবিশেষ। ১৩। কিসের নাম শুনলে জিবে জল আসে?

উপর-নীচ : ২। গুনগুন শব্দ। ৪। অবিকল। ৫। এক রকমের বাজনা। ১০। ভাষণ। ১১। কোন দুটি গরম জিনিস মিলিয়ে ভারতের এক আদিবাসী?

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

	যী	শু		বো	কা	
অ		ক	দ			র
প	ল		ল		ব্যা	ঙ
রা	গ	বি		জ	ঙ্গ	ম
জি	ন		ক		মা	শা
তা		প	রী	ক্ষা		ল
	ট	ঙক		র	জ্জু	

ধাঁধা

সীমামাসিই তার সঙ্গে করে এনেছিল মেয়েটিকে, আমি তখন ছোট্‌কার ঘরে বসে। সীমামাসি ছোট্‌কাকে বলল, "আলাপ করিয়ে দিই। এর নাম তৃণা করগুপ্ত। আমাদের ওখানকার সাহিত্যিক মিঃ করগুপ্তের মেয়ে।"

তৃণা হাত জোড় করে নমস্কার করল ছোট্‌কাকে। তারপর বলল, "আপনার কথা সীমাদির কাছে অনেক শুনেছি। আপনাকে একটা পুজো-সংখ্যা দিই। এটা আমাদের ওখান থেকেই বেরোয়।" বলে ব্যাগ থেকে একটা মোটাসোটা পুজোসংখ্যা বার করে ছোট্‌কার হাতে দিল মেয়েটি। ছোট্‌কা পাতা ওলটাচ্ছে, সীমামাসি বলল, "তৃণার বাবার একটা উপন্যাস রয়েছে এর মধ্যে। 'ললনা' নামে।"

"'তৃণা' নামেও তো একটা উপন্যাস রয়েছে দেখছি।" ছোটকা পাতা ওলটাতে-ওলটাতে বলল, "এ তো দেখছি সবই মেয়েদের নামে উপন্যাস!"

তৃণা নামের মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল, ছোট্‌কাকে প্রায় চমকে দিয়ে বলল, "আপনি তো ধাঁধা ভালবাসেন। তাই এটা আপনার জন্য স্পেশাল উপহার। পাঁচটা উপন্যাস বেরিয়েছে এই সংখ্যায়, বারীন বসুর 'গীতালি', অনিমেষ নন্দীর 'রুক্মিণী', কর্নেল দেব-এর 'মিলিতা', বাবার লেখা 'ললনা' আর..." কথা শেষ করল না তৃণা, একটু থেমে বলল, "আসলে বাবা ও বাবার চার বন্ধু এবার পাঁচটা উপন্যাস লিখেছেন। প্রত্যেকেই তাঁর উপন্যাসের নাম রেখেছেন অন্য এক বন্ধুর মেয়ের নামে। তাই "তৃণা" নামেও রয়েছে একটি উপন্যাস, ডাঃ বসাকের লেখা। এর মধ্যে 'মিলিতা' হল বারীন বসুর মেয়ের নামে, গীতালির বাবার উপন্যাস ডাঃ বসাকের মেয়ের নামে।"

ছোট্‌কা বলল, "একটু দাঁড়াও। আমাকে কী বার করতে হবে?"

তৃণা বলল, "ললনার বাবার নাম।" ছোট্‌কা চেষ্টা করছে। তোমরাও করো। এটাই এবারের প্রথম ধাঁধা।

দ্বিতীয় ধাঁধা॥ এমন কোনও জিনিসের নাম বলতে পারো যা যে কেনে সে নিজের ব্যবহারের জন্য কেনে না, যে ব্যবহার করে সে জানে না কার কেনা?

তৃতীয় ধাঁধা॥ জট ছাড়াও -
গ দ্ প্র ম ত্তা ন

চতুর্থ ধাঁধা॥ সব থেকে লম্বা কোন্ ইংরেজি শব্দ?

গতবারের উত্তর॥ (১) নোংরা সেলুনটিই বাছবে লোকটি। কেন-না, পরিষ্কার সেলুনের মালিকের বাহারি চুল নিশ্চিত এই নোংরা লোকেরই হাতে কাটা। (২) চারটে মোজা (৩) দশটি দস্তানা। (৪) মহিষাসুরমর্দিনী।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

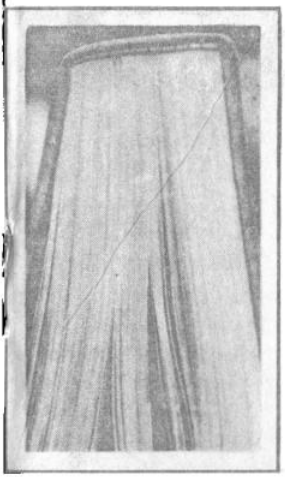

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল কলিং বেলের ফোটো

ফোটো : তপন দত্ত

উত্তর বটে

প্র: কী হে, আগের বারে তো চুরি করে জেলে এসেছিলে, তার আগের বার ছিনতাই করে, এবারে কী করে এলে?

উ: আজ্ঞে পুলিসের গাড়ি করে।

প্র: বৈজ্ঞানিকেরা যে শূন্যে রকেট পাঠায়, তাতে ইঁদুর চাপিয়ে দেয় কেন?

উ: ইঁদুররা যে পৃথিবীতে শস্যের বড় ক্ষতি করছে।

প্র: তিরিশ জন লোক তোমার নীচে কাজ করে, তার মানে তো বেশ বড় চাকরি করো?

উ: আজ্ঞে ঠিক তা নয়। আমি দোতলায় বসি তো, একতলায় তিরিশ জন বসে।

সুসেন

মজার খেলা

একটা দেশলাইবাক্সে ঠিক কুড়টা কাঠি গুনে আগেভাগে রেখে দাও। আর জোগাড় করো একটা লুডো খেলার ছক্কা। ব্যস, তাহলেই তুমি তৈরি এই মজার খেলাটা দেখাবার জন্য। বন্ধুদের ডাকো এবার।

তারা কী করবে বুঝিয়ে দাও। একজন তোমায় না দেখিয়ে ছক্কাটা চালবে। ছক্কায় যত উঠবে, তত গুলো কাঠি সে বার করে নেবে দেশলাইবাক্স থেকে। নিজের পকেটে রাখবে। এবার অন্য এক বন্ধু দেশলাইবাক্সে কত কাঠি রইল তা গুনে দেখবে। ছয়ের বেশি যেহেতু সরছে না, ফলে দু-অঙ্কের কোনো সংখ্যাই পড়ে থাকবে দেশলাই-বাক্সে। সে প্রতি অঙ্কের হিসেবে কাঠি তুলে নিয়ে নিজের পকেটে লুকিয়ে রাখবে। অর্থাৎ, যদি ১৬টা কাঠি থাকে তাহলে ১+৬=৭টা কাঠি সরিয়ে নেবে, ১৮টা থাকলে ১+৮=৯টা কাঠি—এইভাবে হিসেব করে। সবই কিন্তু তোমার অজান্তে। এবার তৃতীয় এক বন্ধু অবশিষ্ট কাঠি থেকে যে-কটা ইচ্ছে তুলে নিয়ে হাতের মুঠোয় লুকিয়ে রাখবে। তোমার হাতে দেবে দেশলাইবাক্সটা। তুমি দেশলাইবাক্সটা খুলে একঝলক দেখেই বলে দিতে পারবে, তৃতীয় বন্ধুর হাতের মুঠোয় কটা কাঠি লুকনো রয়েছে। অথচ সবই তোমার অজান্তে ঘটেছে।

কী করে পারবে? খুব সহজ। দেশলাইবাক্সে শেষ পর্যন্ত কটা কাঠি রইল গুনে ফেলো চটপট। মনে-মনে গুনো। তারপর ৯ থেকে এই কাঠির সংখ্যা বিয়োগ দাও। যে-উত্তর পাবে, সেটাই হবে তৃতীয় বন্ধুর হাতের মুঠোয় লুকনো কাঠির সংখ্যা। হবেই। ম্যাজিক হিসেবেও খেলাটা দেখাতে পারো, এমনই মজার খেলা এটা।

মজারু

হাসিখুশি

সার্কাস দেখতে গিয়ে এক ভদ্রলোক তাঁর বন্ধুদের বলেছিলেন, "আরে এককালে নিজের হাতে কত বাঘ-সিংহ মেরেছি আর এখন সার্কাসের বাঘ দেখাতে আনলি?"

হঠাৎ তাঁবুর বাইরে গোলমাল শোনা গেল, একটা সিংহ নাকি খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়েছে। সবাই পালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, উনি কিন্তু চুপচাপ নিজের আসনেই বসে রইলেন।

সবাই ভদ্রলোকের সাহস দেখে ধন্য-ধন্য করতে লাগল। কিন্তু সিংহ ধরা পড়ার পর দেখা গেল ভদ্রলোক আসলে বহুক্ষণ আগেই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

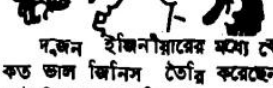

দুজন ইঞ্জিনীয়ারের মধ্যে কে কত ভাল জিনিস তৈরি করেছেন তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল।

প্রথম ইঞ্জিনীয়ার : একবার একটা বড় ব্রিজ নদীর দুদিক থেকে তৈরি করতে-করতে মাঝখানে এসে যখন শেষ করলাম, তখন মাত্র এক মিলিমিটার উঁচু-নিচু হয়েছিল।

দ্বিতীয় ইঞ্জিনীয়ার : আমি পাহাড়ের দুদিক থেকে একটা টানেল কাটতে-কাটতে মাঝখানে মেলাতে না পেরে দুদিক দিয়ে দুটো বার করে দিয়েছিলাম।

প্রথম ইঞ্জিনীয়ার : এটা কি নির্ভুল কাজ হল?

দ্বিতীয় ইঞ্জিনীয়ার : কেন? তুমি যেখানে একটা ব্রিজ তৈরি করলে, সেখানে আমি দুটো টানেল পেয়ে গেলাম।

ছবি : দেবাশিস দত্ত

মোরগের ডাক

(হাঙ্গারির উপকথা)

আরতি দাস

এক মোরগ ওর বউ আর বাচ্চাদের নিয়ে বেশ ভালই ছিল। সারাদিন দানা খুঁটে খেয়ে ঘুরে বেড়িয়ে, দিব্যি ফুর্তিতে দিন কাটত ওদের। হঠাৎ বাড়ির মালিক মারা যাওয়ায় ভারী মুশকিলে পড়ে গেলে ওরা। মালিক নেই। কে-ই বা ওদের খেতে দেয়! আর কে-ই বা দেখছে, তেষ্টায় ওরা জল পেল কি না!

শেষে খিদের জ্বালা সইতে না পেরে, একদিন মা-মুর্গি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

বাড়ির পেছনের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে অনেক ঘুরেটুরে শেষে এক বুনো ন্যাসপাতি গাছের তলায় এসে থ হয়ে গেল মুর্গি। প্রচুর ন্যাসপাতি ফলেছে গাছে। কিছু কাঁচা, কিছু পাকা। অনেক পাকা ফল ঝরে পড়েছে গাছের তলায়। মুখের সামনে অত পাকা ফল দেখে আর থাকতে পারল না মা-মুর্গি। গবগব করে খেতে শুরু করে দিল।

অত তাড়াহুড়ো করে খেতে গেলে বিপদ হবেই। চটপট গিলে ফেলার সময় আধখানা ন্যাসপাতির টুকরো আচমকা আটকে গেল মুর্গির গলায়। ধারেকাছে কোথাও জল নেই। মাটিতে শুয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল মুর্গিটা।

দুটো মুর্গির ছানা আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। মাকে ওরকম করতে দেখে মোরগকে খবর দিতে ছুটল ওরা। খবর পেয়ে

মোরগ চলে এল। মুর্গি মোরগকে বলল, "যেমন করে পার একটু জল এনে দ্যাও। না হলে দম আটকে মরে যাব আমি।"

মোরগ তখনই দৌড়ে চলে গেল পাতকুয়োর কাছে। বলল, "ভাই কুয়ো, শিগগির আমায় একটু জল দাও তো। গলায় ন্যাসপাতির টুকরো আটকে গেছে মুর্গির। জল না পেলে মরে যাবে।"

শুনে হিংসুটে গলায় বলে উঠল কুয়ো, "তা বলে অমনি-অমনি তোমায় জল দেব না আমি। আগে আমায় একগাছা ফুলের মালা এনে দাও, তারপর দেখব। যেমন-তেমন মালা হলে হবে না। যে-মেয়ে খুব সুন্দর দেখতে তার হাতে গাঁথা মালা চাই আমার।"

সঙ্গে-সঙ্গে সুন্দরী মেয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল মোরগ। অনেক খুঁজেপেতে খুব চমৎকার দেখতে একটি মেয়ের কাছে গিয়ে বলল, "তুমি আমায় একগাছা ফুলের মালা গেঁথে দিলে বড় ভাল হয়। ফলের টুকরো গলায় আটকে মরে যাচ্ছে আমার বউ। মালা পেলে পাতকুয়ো জল দেবে আমাকে। সেই জল পেলে বউ বাঁচবে।"

তা শুনে মেয়েটি বলল, "আগে আমায় গোরুর দুধ এনে দাও। দুধ না পেলে মালা দেব না।" এ-কথা শুনেই, দুধের জন্য গোরু খুঁজে বেড়াতে লাগল মোরগ। মাঝ-রাস্তায় নাদুসনুদুস একটি গোরু দেখতে পেয়ে দুধ চাইল। বলল, "ভাই গোরু, আমাকে খানিকটা দুধ দিতে পারলে খুব উপকার হয়। দুধ পেলে সুন্দরী মেয়ে মালা দেবে। আর মালা পেলে পাতকুয়ো জল দেবে আমাকে। গলায় ন্যাসপাতি আটকে মরে যাচ্ছে আমার বউ। জল পেলে বাঁচবে।"

বড় বড় চোখে তাকিয়ে মোরগের কথা শুনল গোরু। তারপর ধীরেসুস্থে বলল "দুধের কথা পরে হবে। আগে ওই মাঠ থেকে চাট্টিখানি ঘাস এনে দাও তো। তারপর দেখা যাবে।"

মোরগ এ-কথা শুনেই মাঠের দিকে ছুটল। কচি-কচি সবুজ ঘাসভরা মাঠকে ডেকে বলল, "ও ভাই মাঠ, আমায় চাট্টিখানি ঘাস দেবে? বড় বিপদ আমার।"

বিপদের কথা শুনে মাঠ তড়বাঁড়িয়ে বলে উঠল, "ঘাসটাস কিসসু পাবে না তুমি। আগে একখানা কাস্তে নিয়ে এসো, তারপর ঘাসের কথা বোলো।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কামারের দোকানে গেল মোরগ। কামারকে দেখতে না পেয়ে

দোকানকে বলল, "ও ভাই দোকান, আমায় একখানা কাস্তে দাও। তাহলে মাঠ আমায় ঘাস দেবে। ঘাস পেলে গোরু দুধ দিতে পারবে। দুধ পেলে সুন্দরী মেয়ে মালা গাঁথবে। আর সেই মালা পেলেই পাতকুয়ো আমায় জল দেবে। জলের অভাবে দম আটকে মরে যাচ্ছে আমার বউ।"

সুব শুনে দোকান ঝাঁপ-খোলা মুখে হো-হো করে হাসল কিছুক্ষণ। তারপর হাসি থামিয়ে ঠাট্টার গলায় বলল, "বিনে পয়সায় জিনিস দেবে কে তোমাকে? আগে পয়সা, তারপর কাস্তে।"

একথা শুনে মাথা ঘুরে গেল মোরগের। পকেটে কলম গুঁজে অফিসে সারা মাস খাটলে তবে তো পয়সার মুখ দেখে মানুষ। মোরগ তো আর অফিসে যায় না! কোত্থেকে পয়সা পাবে!

মনের দুঃখে আস্তাকুঁড়ের দিকে হাটতে লাগল মোরগ। তন্নতন্ন করে জঞ্জাল ঘেঁটে, শেষ পর্যন্ত একটা সিকি পেয়ে গেল। চকচকে সিকিটা দিতেই, দোকান একখানা ধারালো কাস্তে দিল মোরগকে।

কাস্তে পেয়ে মাঠ কচি-কচি নরম সবুজ ঘাস দিয়ে দিল। ঘাস খেতে পেয়ে দুধ দিল গোরু। দুধ পেয়ে মালা গাঁথতে বসল রূপসী মেয়ে। আর সেই মালা কুয়োকে দিতেই ঠান্ডা জল দিল পাতকুয়ো।

জল নিয়েই তড়িঘড়ি ন্যাসপাতিগাছের তলায় ছুটল মোরগ। এসে দেখে জল না পেয়ে শ্বাস আটকে অনেক আগেই মরে গেছে তার বউ।

জলের পাত্রটা জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের খোঁয়াড়ের দিকে চলে গেল দুঃখী মোরগ। কাউকে কিছু বলল না। পাখির দুঃখ কে-ই বা আর বুঝবে!

সেই থেকে আপনমনে ঘুরে বেড়ায় মোরগ। ঘাড় সোজা করে, মাথার ঝুঁটি উঁচিয়ে, লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটে। এমন ভাব দেখায় যেন কিছুই হয়নি ওর। কিন্তু ওর বউ যে একটু জল না পেয়ে দম আটকে মারা গেছে, এ-দুঃখ ও কিছুতেই ভুলতে পারে না। তাই গভীর রাতে মাঝে-মাঝে ডুকরে চেঁচিয়ে ওঠে মোরগ।

আমরা শুনে বলি, মোরগ ডাকছে।

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রের খবর

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রায় পাঁচশো প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। প্রতিযোগী ছিল বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। বিচারক ছিলেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকারগণ।

আঞ্চলিক সংবাদ

আসানসোল আঞ্চলিক মণিমেলাগুলির কাবাডি প্রতিযোগিতায় ভাইদের মধ্যে সোনার তরী ও বোনেদের রেলপার মণিমেলা বিজয়ী হয়। কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় অগ্নিবীণা মণিমেলা।

বসিরহাট অঞ্চলের মণিমেলাগুলি খো-খো প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। ভাইদের মধ্যে রক্তরবি ও বোনেদের মধ্যে সংস্কৃতি মণিমেলা বিজয়ী হয়।

বৈদ্যবাটী আঞ্চলিক মণিমেলা সমাবেশে ব্যায়াম, ছড়ার ব্যায়াম ও হাতের কাজ শেখান হয়।

মণি সন্দেশ

স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কুচকাওয়াজ, ব্যায়াম, ড্রিল প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে সোনার বাংলা, মাতৃমন্দির, হাসিখুশি, সরস্বতী, বড়িশা, বৈশাখী, পুরুলিয়া ভাস্কর স্মৃতি মণিমেলা।

রাখীবন্ধন উৎসব পালন করে বিদ্যার্থী, নতুন পল্লী, কিশলয়, রূপালি ও বৈশাখী মণিমেলা।

গান্ধীজির জন্ম-দিবস সেবামূলক কাজের ভেতর দিয়ে পালন করে ঘাটাল, শিশুতীর্থ মণিমেলা।

অনিবার্য কারণে গত সংখ্যা আনন্দমেলায় 'সদাশিব' প্রকাশিত হয়নি। এ-সংখ্যাতেও হল না। আশা করছি, সামনের সংখ্যায় হবে।

●

ভুল শুধরে নাও : ৮ অক্টোবরের আনন্দমেলায় (পৃ৫৩) যে ছবিটি ছাপা হয়েছে, সেটি জন ম্যাকেনরোর নয়, রসকো ট্যানারের।

সবাই বুড়ো হয়

আমাদের বাড়িতে অনেকদিনের পুরনো একটা টেবিল-ঘড়ি আছে। ঘড়িটা চলতে-চলতে প্রায় রোজই থেমে যায়। বাবা যদি ঘড়িটা একটু নেড়ে-চেড়ে দেয়, তাহলে আবার চলে।

মা বাবাকে বলে, এই ঘড়িটা দিয়ে আর কাজ চলবে না, একটা নতুন ঘড়ি কিনতে হবে। কিন্তু বাবা ঘড়িটা ফেলে না দিয়ে নিজে-নিজেই বসে সারায়।

বাবা বলে, বুড়ো মানুষ যেমন একটানা চলতে পারে না, তেমনি এই বুড়ো ঘড়িটাও পারে না একসঙ্গে বেশিক্ষণ চলতে। কিন্তু, আজ ক'দিন হল ঘড়ি অনেক নাড়িয়েও আর চলছে না। বাবা এসে অনেক দেখে-দেখে যেই ঘড়িটাকে কাত করে শুইয়ে রেখেছে, অমনি ঘড়ি চলতে শুরু করেছে।

বাবা বলেছে, ওর আর দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই, ও তাই শুয়ে-শুয়েই চলছে। মানুষ বুড়ো হয় জানতাম, কিন্তু বাবা বলল, সবাই বুড়ো হয়।

সোমদত্তা সেনগুপ্ত (বয়স ১০)

ছোট্ট চড়ুই

ঝুরঝুরে ঐ পাতাগুলি
নড়ে হাওয়ার তালে,
মাঝে মাঝে ছোট্ট চড়ুই
বসে গাছের ডালে।
ছোট্ট ছোট্ট ডাল জমিয়ে
ছোট্ট বাসা বানায়
খিদে পেলে কিচিরমিচির
আওয়াজ করে জানায়।

অরুণাভ বসু (বয়স ১২)

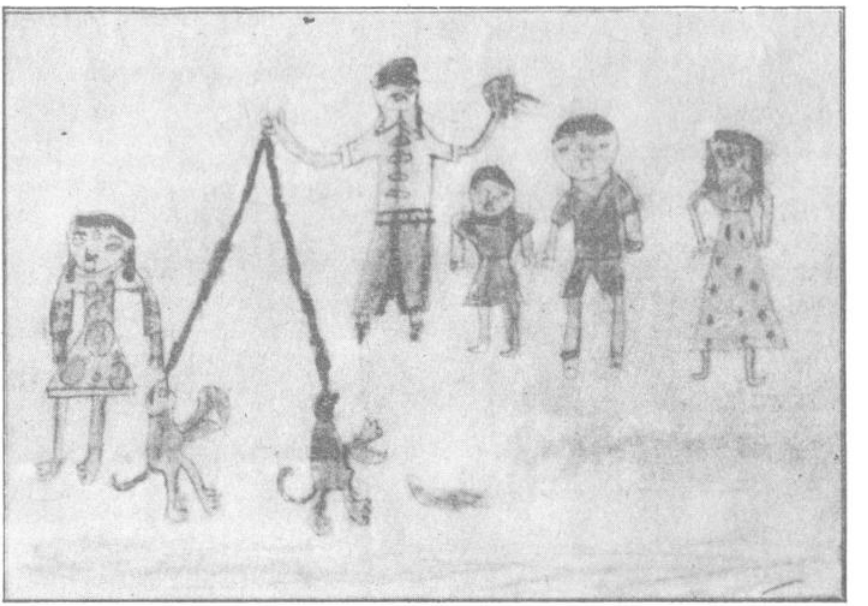

ছবি এঁকেছে **সোমনাথ মুখোপাধ্যায়** (বয়স ৭)

ছাব এঁকেছে **সংবৎ বন্দ্যোপাধ্যায়** (বয়স ৮)

লোডশেডিং

কটা বাজে ?
নটা, সাড়ে ন'টা হবে।
এখুনি
পাখাটাও যাবে।

আনন্দরূপ চট্টোপাধ্যায় (বয়স ৫)

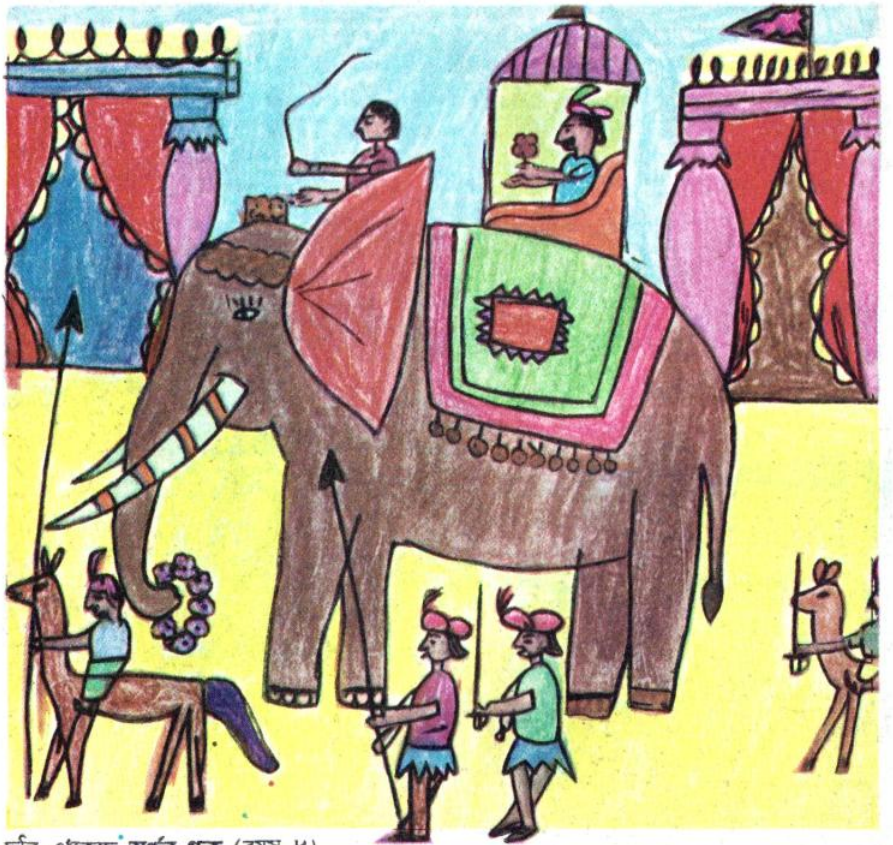

ছবি এঁকেছে **অর্ণব গুহ** (বয়স ৮)

(পাতা ওলটালেই 'ডি সি এম' ট্রফির খবর)

মহামেডানের দিল্লি জয়

অশোক দাশগুপ্ত

কলকাতায় ফেডারেশন কাপ শুরু হবার আগের দিন দুপুর। তিনজনের হালকা চালের কথাবার্তা ধীরে - ধীরে গম্ভীর হয়ে গেল, যখন হঠাৎই প্রশ্ন করলাম, "তাহলে চিন্ময়, কাল থেকে আমরা সকলেই বুঝতে পারছি এবার সব ট্রফি তুলবে মহামেডান স্পোর্টিং?" এই প্রশ্নটা যে কিসের পিঠে এল, তা মনে নেই. কিন্তু চিন্ময় চ্যাটার্জির জবাবটা মনে আছে : "ট্রফির কথা জানি না, তবে আমি .....আমরা যে প্রাণ দিয়ে খেলব তাতে কোনো সন্দেহ নেই।" আরো পরিষ্কার করে বললেন সুরজিৎ সেনগুপ্ত। "ট্রফি? হ্যাঁ পাব। শুরুতেই কতটা কী হবে জানি না, তবে এই মহামেডান টীম দাঁড়াবেই। সকলেই সব টুর্নামেন্টে ফর্মে থাকবে না, কিন্তু সব মিলিয়ে এই টীম এত ভাল যে—"

"এত ভাল যে, দার্জিলিং গোল্ড কাপে প্রথম ম্যাচেই হেরে যেতে হল!" পুজোর আগে দার্জিলিঙে মহামেডানের বিপর্যয় দেখে এমন মন্তব্য অবশ্যই করা যেত।

সিকিমের ছোট্ট টুর্নামেন্টে জিতে একটু ধাতস্থ হবার পর মহামেডান স্পোর্টিং দিল্লি গেল ডি সি এম টুর্নামেন্ট খেলতে। প্রাথমিক পর্যায়ে দুটি ম্যাচে জিতল ৪—০ (অমিত বাগচী ২, চিন্ময় এবং অমলরাজ) এবং ২—০ (আকবর) গোলে। সিনেমা হলে মূল ছবি শুরুর আগে এ তো হল ট্রেলার। আসল গ্রুপ লীগে, প্রথম ম্যাচেই মহামেডান হেরে গেল। গোল করার অজস্র সুযোগ নষ্ট করে ওদের এক গোলে হারতে হল দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যাংক অব সিওল অ্যান্ড ট্রাস্ট কোম্পানির কাছে।

গ্রুপ লীগের দ্বিতীয় ম্যাচে মহামেডানের প্রতিদ্বন্দ্বী হায়দরাবাদ দল, যারা আগে দক্ষিণ কোরিয়ার টীমকে ২—১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভেঙে-পড়া মিনার গড়ে তোলার দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের সামনে অনেক হিসেবেই উল্টে যায়। মহামেডান স্পোর্টিং হায়দরাবাদ দলকে কচুকাটা করে পরিষ্কার চার গোলে। সাব্বির আলি (২) গোল করার অভ্যাস ফিরে পেলেন, আকবর গোল করার অভ্যাস বজায় রাখলেন আর একটি গোল করলেন দেবাশিস রায়।

পরের ম্যাচ ফাগোয়ার জে সি টি-র সঙ্গে! দার্জিলিং-এর হারের প্রতিশোধ নিল মহামেডান স্পোর্টিং। টানা নব্বুই মিনিট ঝড়ের গতিতে ফুটবল খেলে দিল্লির মাটিতে কলকাতার ফুটবলের পতাকা আর-একবার ওড়ানোর সম্ভাবনা জাগালেন সাদা-কালোর এগারোজন ফুটবলার। তবু সেরার মধ্যেও সেরা থাকে। এইদিন প্রশান্ত ব্যানার্জির খেলায় ছিল একই সঙ্গে জল এবং আগুন। জল—মধ্যমাঠেই বিপক্ষের আক্রমণকে নিবিয়ে দেওয়ার জন্য। আগুন—মধ্যমাঠ থেকেই বিপক্ষ-রক্ষণকে ভস্মে পরিণত করার জন্য! আকবর প্রথম গোল করার পর একটি পেনাল্টি মিস করলেন। আহত চিন্ময় চ্যাটার্জি এইদিন খেলেননি। খেললে, পেনাল্টি-স্পেশালিস্ট চিন্ময় মহামেডানকে অবশ্যই ২—০ গোলে এগিয়ে দিতেন। খেলাটিকে অবশ্য অনায়াসে দু-গোলের ব্যবধানে নিয়ে এলেন প্রশান্ত ব্যানার্জি। এই দুর্দান্ত বাঁ পা-টি (প্রসূন ব্যানার্জির বাঁ পায়ের পথ ধরে) আরো অনেক প্রতিপক্ষকে অদূর ভবিষ্যতে কাঁদাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ৩—০ করেন সাব্বির আলি। ফিলিপ অমলরাজ আকবর দেবাশিস—প্রায় সকলেই ফর্মে ছিলেন। কার্টিলেজ অপারেশনের পর সুরজিৎ সেনগুপ্ত বেশ কিছু ম্যাচে খুব কম ঝুঁকি নিয়েছেন। সিকিম গোল্ড কাপের শেষ দুটি ম্যাচে তিনি টীমকে চমৎকারভাবে খেলিয়েছিলেন। জে সি টির বিরুদ্ধে ফর্ম অনুযায়ী খেলে মহামেডান স্পোর্টিংকে সেমিফাইনালে উঠতে সাহায্য করলেন।

মহামেডানের গ্রুপ থেকে আর এক সেমি-ফাইনালিস্ট হল দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যাংক অব সিওল অ্যান্ড ট্রাস্ট কোম্পানি। অন্য গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে এল ইস্টবেঙ্গল এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। ইস্টবেঙ্গল সরাসরি গ্রুপ লীগে খেলে। প্রথম ম্যাচে কলকাতারই

রাজস্থানকে ৪—০ (মজিদ ২, জামশিদ ২) গোলে হারালেও দ্বিতীয় ম্যাচে ঠোক্কর খায় (০—০) ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্সের সঙ্গে। কিন্তু গ্রুপের শেষ ম্যাচে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে দারুণ খেলে এক গোলে (মজিদ) হারাতেই ইস্টবেঙ্গল-সমর্থকরা জেগে উঠলেন। কোনো সন্দেহ নেই, টীমকে অনেকখানি টেনে এনেছেন সেরা কোচ পি কে ব্যানার্জি। কিন্তু নেপোলিয়ন যা-ই বলে থাকুন, 'অসম্ভব' বলে একটা শব্দ সব ডিকশনারিতেই আছে। সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার ফুটবলারদের কাছে নাজেহাল ইস্টবেঙ্গল হারল পরিষ্কার তিন গোলে।

প্রচণ্ড কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল দিল্লিতে। ফুটবল-জ্বর। কে জিতবে? ভারতের মহামেডান স্পোর্টিং, না দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যাংক অফ সিওল অ্যান্ড ট্রাস্ট কোম্পানি?

এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল ফাইনাল খেলা শুরু হবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই। বোঝা গেল, এই ম্যাচ এবং ট্রফি মহামেডান হাতছাড়া করবে না। অমলরাজ এবং প্রশান্ত ব্যানার্জি এইদিনও মধ্যমাঠের রাজত্বে কারো উপদ্রব সহ্য করলেন না। দ্বিতীয়ার্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার মরিয়া ফুটবলাররা যখন বারবার মহামেডান দুর্গে কামান দেগেছেন, তখন জান লড়িয়ে খেলছেন চার ডীপ ডিফেন্ডার—প্রেমনাথ ফিলিপ, মইদুল ইসলাম, রমেন ভট্টাচার্য এবং চিন্ময় চ্যাটার্জি। আর অবশ্যই দুর্ভেদ্য থাকলেন এক নম্বর ফুটবলার—ভাস্কর গাঙ্গুলি। শেষের দিকে একটি অবধারিত গোল বাঁচালেন। না-বাঁচালে, ১—১ হত। ১—১ হলে রিপ্লে হত। রিপ্লে হলে কী হত কে বলতে পারে?

এক এবং একমাত্র গোলটি করেছেন সেই দেবাশিস রায়। কোন্ দেবাশিস রায়? যে দেবাশিস রায় উনিশশো উনআশির লীগে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গোল করেছিলেন। যে দেবাশিস রায় এবার ফেডারেশন কাপের কয়েকটি ম্যাচেই খোদ পি কে ব্যানার্জির স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন কলকাতার দ্রুততম ফরোয়ার্ড হিসেবে। সেই দেবাশিস রায়—যাঁকে নিয়ে গত বছর কোয়েম্বাটোরে একটা প্রশ্ন করতে হয়েছিল। তখনো পর্যন্ত দেবাশিস

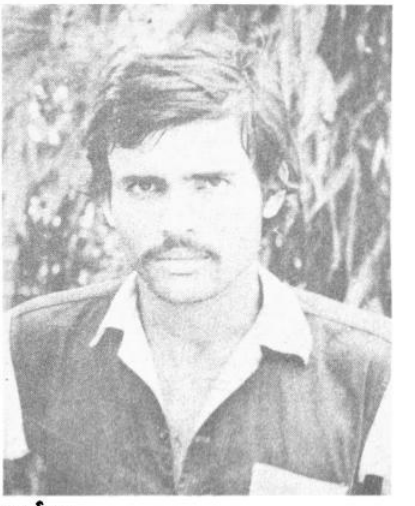

দেবাশিস

মূলত স্ট্রাইকার ছিলেন। প্রথম দিকের খেলাগুলোয় পায়াস বা সাব্বির আলি কেউই ভাল খেলতে পারছিলেন না। ডোভিডও ব্যর্থ। একদিন সকালে তিন-চার জন ফুটবলারের সঙ্গে গল্প করার সময় স্ট্রাইকার-প্রসঙ্গ উঠল। আমি বললাম, "এখনো পর্যন্ত কোনো স্ট্রাইকারই যখন ভাল খেলতে পারছে না, দেবাশিসকে একদিন খেলিয়ে দেখতে অসুবিধা কোথায়?" সত্যজিৎ মিত্র জবাব দিয়েছিলেন, "অসুবিধা একটাই, দেবাশিসকে একদিন খেলালে রোজ খেলাতে হবে। বাদ দেওয়া যাবে না।"

এবার মহামেডান স্পোর্টিংয়ের প্রথম টীমে দেবাশিস রায় ছিলেন না। ফেডারেশন কাপের দ্বিতীয় ম্যাচে সুরজিৎ সেনগুপ্ত আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়ায় টীমে ঢোকেন। ডেভিড উইলিয়ামস নিরুদ্দেশ হওয়ায় লীগে কিছুটা সুবিধা হয়তো হয়েছে, কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, তারপর থেকে আর দেবাশিসকে মহামেডান স্পোর্টিং টীম থেকে বাদ দেওয়া যায়নি। ঐ যে সত্যজিৎ বলেছিলেন, একটাই অসুবিধা, দেবাশিসকে একদিন খেলালে রোজ খেলাতে হবে। এবার কটকে সন্তোষ ট্রফির আসরে দেবাশিসকে খেলানোর আগে নির্বাচকরা আশা করি এই 'অসুবিধা'র কথাটা মনে রাখবেন!

ফোটো: নিখিল ভট্টাচার্য

৮/৮ নাবালিয়া পাড়া রোড, কলিকাতা-৮

প্রিয় সি. এম. ডি. এ কাকু,

তারিখ : ৩০/৮/৮০

গত ১৫ই আগষ্টের আনন্দমেলায় তোমরা আমাদের ছোটদের কাছ থেকে সি,এম,ডি.এ'র কাজকর্ম সম্বন্ধে ছবি ও লেখা চেয়েছো দেখে ভীষণ খুশি হয়েছি। জানো, বড়রা তোমাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন, কাগজেও লেখালেখি হয় প্রায়ই। বড়রা যখন কথা বলেন, তখন প্রত্যেকেই ভাবেন, তাঁর মত এমন বিজ্ঞোচিত কথা আর কেউ বলেননি এবং তাঁরা প্রতিবাদ সহ্য করতে নারাজ।

মাত্র চোদ্দ বছর আগে আমার জন্ম। একটু যখন জ্ঞান হল তখন কলকাতাকে কী দেখেছি? একটা প্রাচীন, অতিবৃদ্ধ শহর যা তৈরী হয়েছিল খুব বেশী হলে ২০ লক্ষের মত লোকের বাসের জন্য, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য। এই ২০ লক্ষ লোক ছাড়াও আরও বাড়তি দশ লক্ষ লোকের জন্য শহরকে ঘিরে তৈরী হল অনেক ঘিঞ্জি, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর বস্তি এবং উপকণ্ঠের অনুন্নত পাড়াগুলো। জনসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে, বাড়ছে ব্যবসা-বাণিজ্য। দেশ বিভাগের পর ছিন্নমূল লক্ষ লক্ষ লোকও ভিড় করলেন এই শহরের সীমিত পরিসরের মধ্যে। শহরে বাড়ির ভিড় বাড়লো, ভিড় বাড়লো বস্তিতে, একটুও খালি জায়গা পড়ে রইল না। আসল কলকাতা শহরতলীর সীমানা ছাড়িয়ে উপচে পড়ল। কিন্তু এই যে শহর বাড়ছে, বাড়ছে লোক, তার জন্য কি আগাম কোন পরিকল্পনা ছিল? মোটেই না।

গাড়ীঘোড়া, লোকজনের ভিড়ে রাস্তায় চলা দায়। যে বাজারগুলো আছে, তাতে চাহিদা মেটেনা। রাস্তায় বাজার বসে। হাঁটাচলা দায় হয়ে ওঠে। মাটির তলায় মান্ধাতার আমলের ড্রেনগুলো ভরাট হয়ে গেছে, একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তা হয়ে যায় নদী। শহরতলীর পাড়াগুলোও তৈরী হয়েছিল এলোমেলো পরিকল্পনাহীন ভাবে। সরু সরু কাঁচা রাস্তা, জলনিকাশী নর্দমা না থাকবারই মত। তারপর সেই সর্বনাশা, ব্যাপক যানবাহন সমস্যা তো আছেই। চাহিদা অনুপাতে গাড়ীঘোড়া তো কম বটেই, তবু রাস্তাঘাট বড় এবং ভালো থাকলে আরও দ্রুত গাড়ীঘোড়া চলতে পারতো। আমাদের আর একটু সময় বাঁচতো, কষ্ট কম হতো।

বৃহত্তর কলকাতার এই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে তোমরা সি, এম, ডি, এ এলে আশার আলো জ্বালিয়ে। তোমরা ধীরে ধীরে অনেক রাস্তা নতুন ভাবে বানিয়েছো বড়ো করে। রাস্তার নীচে নতুন পয়ঃপ্রণালী তৈরী করে বৃহত্তর কলকাতার এক বড় অংশকে লাগাতার বানভাসি থেকে মুক্তি দিয়েছো। অনেকগুলি উড়ালপুল বানিয়ে গাড়ীঘোড়া চলার পথের জট খুলেছো, আরও অনেকগুলোর কাজ হাতে নিয়েছো। অনেক বড় বড় বাজার তোমরা তৈরী করেছো—ভবিষ্যতে আরও করবে।

রাস্তার বা পার্কের ধারে গাছ পুঁতে তোমরা কলকাতার বুকে সবুজের সঞ্চার করছো।

একটা কথা চুপি চুপি বলি? আনন্দমেলায় এবং অন্যত্র তোমাদের দেওয়া বিজ্ঞাপন-গুলোও পড়তে ভারি ভালো লাগে। বিজ্ঞাপন বলে মনেই হয় না, এত সুন্দর।

সবজান্তারা তোমাদের নিন্দা করে। যেন কাজটা তাদের হাতে পড়লে তারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতাকে অলকাপুরী বানিয়ে দিত। নিন্দায় কান দিও না। আমরা ছোটরা তোমাদের পেছনে আছি। আমরা জানি অদূর ভবিষ্যতেই তোমাদের অক্লান্ত শ্রম ও নিষ্ঠার বিনিময়ে আমরা পাবো সেই কলকাতাকে যা বিশ্বের যে কোন সুন্দর শহরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

স্বাতী বসু, বয়স—(১৪ বছর)

আমরা ১৬ই আগষ্ট সংখ্যার আনন্দমেলায় পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছিলাম।
স্বাতী বসুর এই লেখাটি প্রথম পুরস্কার ৫০,টাকা পেল।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ. ৩-এ অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা ৭০০০১৭ থেকে প্রচারিত।)

ক্রিকেটের বিদ্বান

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

তিন বছর বাদে ভারতীয় ক্রিকেট দল খেলছে অস্ট্রেলিয়ায়। 'ডন' ব্র্যাডম্যানের দেশে। সত্যি, ব্র্যাডম্যানকে বাদ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার কথা ভাবা যায়? খেলার রাজা, রাজার খেলা ক্রিকেট। ব্র্যাডম্যান সেই ক্রিকেটের রাজা। না, বরং বলি ক্রিকেটের বিদ্বান। "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে"—মনে পড়ছে না?

ব্র্যাডম্যান আউট হয়ে যাবার পর অস্ট্রেলিয়ার মাঠ প্রায় খালি হয়ে যেত। জনপ্রিয়তার এ এক অদ্ভুত রেকর্ড। ব্র্যাডম্যানের ক্রিকেট-রেকর্ড? সে তো সংখ্যায় কম নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে খেলা বন্ধ না থাকলে যে এইসব রেকর্ড কোথায় দাঁড়াত কে জানে! স্যার ডোনাল্ড অবসর নেওয়ার বত্রিশ বছর পরেও তাঁর বেশ কয়েকটি রেকর্ড সগর্বে অম্লান। সব রেকর্ডের কথা তিনি নিজেই বলতে পারবেন কি না সন্দেহ।

রেকর্ডের কথা থাক। বরং নানারকম টুকরো গল্প শোনা যাক। ছোটবেলায় বাড়ির পিছনে একটা ক্রিকেট স্টাম্পকে 'ব্যাট' করে গলফ বল নিয়ে খেলতেন। তখনকার নামী খেলোয়াড়দের নিয়ে দুটি দল করে একা একাই 'টেস্ট' খেলতেন—কখনও টেলর হয়ে ব্যাট করতেন, কখনও বা গ্রেগরি কি কলিন্স। বোলার? কেউ ছিল না। বলটি ছুঁড়ে দিতেন একটি জলের ট্যাঙ্কের স্ট্যান্ডের গায়ে, প্রতিহত হয়ে ফিরে এলে 'ব্যাট' চালাতেন। 'টেস্ট' চলার মাঝে খাবার জন্যে মা ডাক দিলেই অসুবিধে হত দারুণ। মা অবশ্য তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানকে উৎসাহ দিতেন। সতেরো বছরের ব্র্যাডম্যানকে মা বলেছিলেন বিশেষ একটি খেলায় সেঞ্চুরি করতে পারলে একটা ব্যাট দেবেন। অবশ্য ৩০০ করে ব্র্যাডম্যান যখন তিনটি ব্যাট চেয়েছিলেন, তিনি সে-আবদার রাখেননি।

বাবাকে অনেক কাকুতিমিনতি করে তাঁর সঙ্গে সিডনিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট দেখতে গিয়েছিলেন তেরো বছরের ডোনাল্ড। তাঁর দেখা প্রথম টেস্ট তথা ফার্স্ট-ক্লাস ক্রিকেট। ওটাই আবার তাঁর প্রিয়তম সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। ঐ মাঠেই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের শততম ফার্স্ট-ক্লাস সেঞ্চুরিটি। ভারতের মাটিতে অবশ্য তিনি কোনওদিন খেলেননি।

ব্র্যাডম্যানের কোচ? কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ স্বভাব-ব্যাটসম্যান। অবশ্য সকলের ক্ষেত্রে এ রকম হয় না। কারণ ব্র্যাডম্যানের কয়েকটি সম্পদ ছিল যেন ঈশ্বরপ্রদত্ত। যেমন তাঁর 'চোখ'। ব্র্যাডম্যানের চোখ তখনকার ও এখনকার যে-কোনও ক্রিকেটারের ঈর্ষার বস্তু। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি একবার ব্র্যাডম্যান শখ করে স্কোয়াশ খেলা ধরলেন। খেলা আরম্ভের কিছুদিন পরেই তিনি তখনকার নামী অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় ইয়ান ম্যাকলাকলানকে হারিয়ে দেন। শুধু তাই নয়। সেবার তিনি সাউথ অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়ানও হন। অত ভাল চোখের জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছিল। আবার কয়েক বছর পরে যখন যুদ্ধের সময় ব্র্যাডম্যান বিমানবাহিনীতে নাম লেখান তখন সেখানকার একজন চক্ষুবিশেষজ্ঞ দারুণভাবে ব্র্যাডম্যানকে ধরাধরি করেন তাঁর চোখ পরীক্ষা করবেন বলে। ভদ্রলোকের কাজ ছিল পাইলটদের চোখের সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করা। তাই ব্র্যাডম্যানের চোখের মতো

চোখ পেয়ে পরীক্ষা করার সুযোগ তিনি ছাড়বেন কেন?

বিজয় হাজারে ব্র্যাডম্যানের বিশ্লেষণী-ক্ষমতার একটা গল্প বলেছেন। একবার ব্র্যাডম্যান বল পাঠিয়েছেন কভার পয়েন্টের বাঁদিকে। একটি রান সহজেই আসে। কিন্তু ব্যাডম্যান অপরদিকের ব্যাটসম্যানকে রান নেওয়া থেকে নিরস্ত করলেন। এটা একটা বিরল ঘটনা। পরে বিস্মিত পার্টনারকে ও ফীল্ডারটিকে ব্র্যাডম্যান জানান, তিনি খবর নিয়ে জেনেছিলেন যে, ফীল্ডারটির দু'হাতই সমান চলে। অতএব বাঁ হাত বাড়িয়ে বলটি নিয়ে সে উইকেটে থ্রো করতে পারত। তাই।

রসিকতাতেও ব্র্যাডম্যান কম যান না। একবার ইয়র্কশায়ারের রন অ্যাসপিনল তাঁকে পর-পর বাম্পার দিয়ে যাচ্ছেন আর তিনিও মনের আনন্দে 'হুক' করে বাউন্ডারি করছেন। ওভার শেষ হলে ব্র্যাডম্যান তাঁর পার্টনারকে বললেন, "চমৎকার! অতিরিক্ত বাম্পার দেওয়ার জন্যে ওরা আবার বোলার-টিকে তুলে নেয় না যেন!" আর-একবার এক ক্রীড়া সাংবাদিক লিখলেন, সেঞ্চুরি হয়ে গেলেই ভিক্টর ট্রাম্পার কোনও যোগ্য বোলারকে উইকেটটি ছেড়ে দেন, কিন্তু ব্র্যাড-ম্যান একশোর পর দুশো তারপর আরও রান না করে ক্ষান্ত হন না। লেখাটা পড়েই ব্যাডম্যান মন্তব্য করলেন তাহলে ইংল্যান্ডে যখন সেবার ট্রাম্পার এক ইনিংসে ৩০০ রান করেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই নিয়মটা ভুলে গিয়েছিলেন।

ব্র্যাডম্যান তখন ইংল্যান্ডে। অস্ট্রেলিয়ায় খবর এল, ব্র্যাডম্যান মারা গেছেন। আসলে ব্র্যাডম্যান অ্যাপেনডিসাইটিসের জন্যে খুবই অসুস্থ হয়েছিলেন, তাঁর অপারেশন হচ্ছিল। অবশ্য, তাঁর কথায়, তিনি প্রায় মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছিলেন। গুজব শুনে মিসেস ব্র্যাডম্যানের সে কী অবস্থা!

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে কারও জীবনকালে তাঁর মৃত্যুর গুজব রটলে তিনি শতায়ু হন। প্রার্থনা করি ব্র্যাডম্যান তাই হোন। এখন তাঁর (জন্ম ২৭ আগস্ট ১৯০৮) তিয়াত্তর চলছে। কিন্তু ব্র্যাডম্যানের মতো ব্যক্তির কাছে ওটা আবার একটা স্কোর নাকি?

একমাত্র গাছগাছড়ার ভেষজগুণ দাঁতকে ক্ষয় থেকে বাঁচাতে পারে

এক মাত্র নিম

টুথপেস্টেই আছে নিমগাছের
যাবতীয় ভেষজ ও ঔষধীয় গুণ

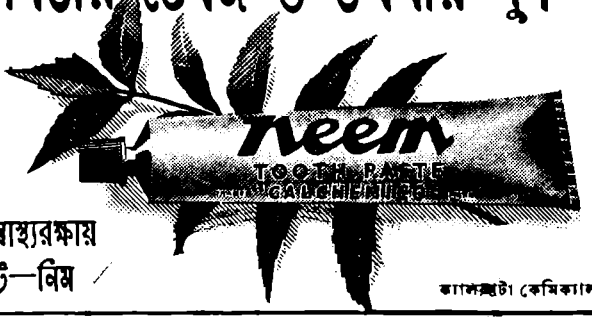

দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্যরক্ষায়
অদ্বিতীয় টুথপেস্ট—নিম

ক্যালকাটা কেমিক্যাল—এর তৈরী

আগের কথা : হাজারিবাগ থেকে বেড়িয়ে এসে শিশির অসুস্থ হয়ে পড়ে। জ্বর হয়, চোখের সামনে অদ্ভুত-অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে থাকে। এদিকে গড়ের মাঠে একটা অচেনা লোক তাকে বলে বসল, কাছে যা আছে, "সেটা না রাখাই ভাল। নয়ত আরও ক্ষতি হবে।" তারপর

॥ ২ ॥

লোকটার কথা ভাবতে-ভাবতে বাড়ি ফিরল শিশির।

শিশিররা থাকে ডাফ স্ট্রীটে।। ঠাকুরদার আমলের বাড়ি। খুব বড়ও নয়, আবার ছোটও না। মাঝারি। শিশিরের ছেলেবেলায় তার বাবা বাড়িটার অনেক কিছু অদল-বদল করেছিলেন। এখন নীচে গ্যারাজ, ভজন দরোয়ানের থাকার জায়গা, বাবার মক্কেলদের বসার ঘর। পেছনের দিকে কাজের লোকরা থাকে। তুলসীদা থাকে অন্য পাশে।

বাড়ি ফিরে শিশির সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছে, বাবার সঙ্গে দেখা। অমৃতবাবু নীচে নামছিলেন। মক্কেলরা এসে বসে আছে। পেশায় তিনি অ্যাডভোকেট। আর একমাত্র নেশা হল গানবাজনা শোনা। একসময় নিজে সেতারি হবার চেষ্টা করেছিলেন, হতে পারেননি, তবে ঝোঁকটা থেকে গিয়েছে, কাজকর্মের ফাঁকে ভাল গানবাজনা থাকলে এখনও শুনতে যান।

মানুষটা শৌখিন। পোশাকে-আশাকে পরিচ্ছন্ন। বাড়ির মধ্যে এলোমেলো কিছুই পছন্দ করেন না।

অমৃতবাবু নামছিলেন। পরনে দিশি ধুতি, গায়ে ফতুয়া-পাঞ্জাবি, ডান হাতে চাবির গোছা, চশমা।

"কী রে, এই ফিরলি? কেমন আছিস আজ?"

"সেই রকম," শিশির বলল।

"তোর চোখমুখ শুকনো দেখাচ্ছে! বেশি হেঁটেছিস?"

"না।"

"যা, জামাকাপড় ছেড়ে গা ধুয়ে ফেল। রাত্তিরে তোকে একটা কথা বলব।"

শিশিরেরও মনে হল, মাঠের লোকটার কথা বাবাকে বলে। বলল না, পরে বললেই চলবে।

নিজের ঘরে এসে শিশির কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল। তার মাথা ঘাড়ের যন্ত্রণা একই রকম। চোখও জ্বালা করছিল। গা-হাত ধোয়ার পর একটু আরাম লাগবে, তারপর আবার যে কে সেই।

খানিকক্ষণ জিরিয়ে শিশির বাথরুমে চলে গেল।

ভাদ্র মাস। দারুণ গুমোট চলছে। সাবান মেখে স্নান করার সময় হঠাৎ ডান হাত থেকে আঙটিটা খুলে মেঝেতে পড়ে গেল। শিশির নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল আঙটিটা। সোনার আঙটি নয়, রুপোরও নয়। একেবারে সিসের আঙটি। সিসে কি? হয়ত সিসেও নয়। কিসের যে, শিশির ঠিক জানে না। হাজারিবাগে পিসির বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দশটা ফালতু জিনিসের মধ্যে পেয়েছিল। আসলে আঙটিটা ছিল পিসিমার হাত-বাক্সে। একদিন পিসিমা তাঁর হাতবাক্স খুলে কী একটা খুঁজছিলেন। সেকেলে হাতবাক্স। শোনা যায় ঠাকুরমার বিয়ের হাতবাক্স। বিলেতি পুতুল, হাতির দাঁতের ব্রোচ, রুপোর কাঁটা, হেয়ার পিন— এইসব সেকেলে কত জিনিস একসময় পড়ে থাকত বাক্সটায়। সবই ঠাকুমার। পিসির ওই বাক্সর ওপর বরাবরের লোভ। বড় পিসির বিয়ের সময় মায়ের স্মৃতি হিসেবে বাক্সটা পিসিমা নিয়ে নেন। তারপর যা হয়, ঠাকুমার সেই পুতুল, ব্রোচ, হেয়ার পিন আর নেই, কিন্তু দু একটা পুতুল, টিনের কৌটোতে কোন্ ঠাকুরের মন্দিরের এক চিলতে মাটি, পিসিমার ছেলেবেলার ক্রুশ-কাঁটা, টুকরো-টাকরা সোনার কুচি, পিসিমার নিজের খুচরো খরচের জন্যে কটা টাকা পড়ে আছে।

আঙটিটা ওই বাক্সে ছিল। ন্যাপথালিনের গুলি, মেশিনের ছুঁচ, তামার ডবল পয়সার পাশেই পড়ে ছিল আঙটিটা।

শিশিরের চোখে পড়ে গেল আঙটিটা। তুলে নিল। ভারী আঙটি, সিকি ইঞ্চির মতন চওড়া মাথায় বিদঘুটে একটা আঁকাজোকা। সেটা হরফের মতন দেখায়। কখনও মনে হয় আরবি-ফারসি, কখনও মনে হয় নেপালি, কখনও আবার অন্যরকম কিছু। শিশির আঙটিটা নিয়ে নিল। সোনার আংটি সে পরে না। এই আঙটিটা হাতে থাকলে বেশ অসাধারণ কিছু দেখাবে। তা ছাড়া ওই বস্তু দিয়ে কাউকে একটা ঘুঁষি মারলে দারুণ জমবে।

"এটা আমি নিলাম।"

"ওই আঙটি কেউ পরে! তোকে একটা পোখরাজের আঙটি দেব।"

"পোখরাজ দরকার নেই। এটাই নেব। কোথায় পেয়েছিলে এটা?"

"সারনাথে। তোর পিসেমশাই, আমি আর ঝুনু একবার কাশীতে গিয়ে দিন দশেক ছিলাম। একদিন সারনাথে বেড়াতে যাই। বেড়াতে-বেড়াতে মাঠে কুড়িয়ে পেয়েছিল ঝুনু। তা ওই আঙটি আর কে পরবে। ফেলেই দিতাম, নেহাত অমন দেখতে বলে রেখে দিয়েছি।"

"কী লেখা আছে?"

"কে জানে! মাথামুন্ডু কিছুই বুঝিনি। দরকার নেই আমার বুঝে।"

"আঙটিটা নিলাম।"

"নে।"

শিশির আঙটিটা নিয়ে খানিক মাজাঘষা করল। যেমন-কে প্রায় তেমনই থাকল। আঙটিটা পরে নিল বাঁ হাতে। মাঝ আঙুলে। সামান্য ঢিলে হয়ে থাকল।

স্নান করে গা হাত মোছার সময় শিশিরের হঠাৎ মনে হল, মাঠের লোকটা তাকে বারবার বলছিল, "কী আছে কাছে? খুলে রাখুন।" কেন বলছিল? শিশিরেরও মনে হয়নি, এই সিসে বা লোহার আঙটিটার কোনো মূল্য থাকতে পারে! কেউ এটা ছুঁয়েও দেখবে না। রাস্তায় ফেলে দিলে তাকাবে না কেউ। এতই অকিঞ্চিৎকর এটা যে, শিশিরের একবারের জন্যেও আঙটিটার কথা মনে পড়েনি। আচ্ছা, লোকটা কি আংটিটা দেখেছিল? দেখতে পারে। জায়গাটা অবশ্য অন্ধকার-মতনই ছিল। তবু অমন বেঢপ আঙটি চোখে পড়তে পারে লোকটার। কিন্তু লোকটা তো একবারও আঙটির কথা বলল না।

অবশ্য এত কথা ভাববার কী আছে? আঙটিটা খুলে রাখলে কি শিশির আগের মতন স্বাভাবিক হয়ে যাবে?

শিশির স্নান শেষ করে ঘরে এল। তার কৌতূহল হচ্ছিল। বিশ্বাস হচ্ছিল না। ঠিক আছে; দেখাই যাক না।

হাত থেকে আঙটিটা খুলে শিশির টেবিলের ওপর রেখে দিল। দিয়ে মুখ মুছল, চুল আঁচড়াল। তারপর ঘরের বাইরে এসে মধুকে ডাকল।

মধু কাজ করছিল, সাড়া দিল। এল সামান্য পরে।

"চা দেবে না?" শিশির বলল।

"চা খাবে? তোমার এখন দুধ খাবার কথা।"

"দুধ পরে খাব। চা দাও।"

"চায়ের সঙ্গে আর কী খাবে?"

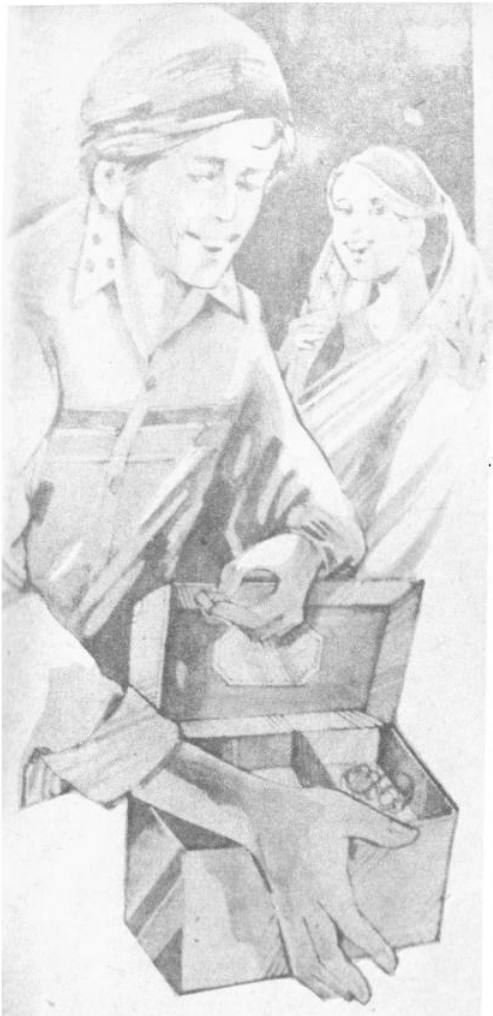

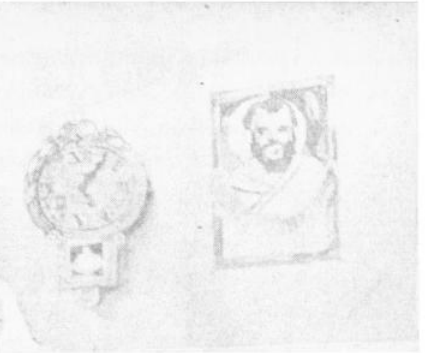

"দাও যা হয়—; ঝালটাল কিছু খাওয়াও না।"

"তুমি ঘরে যাও, চা আনছি।"

শিশির আবার ঘরে ফিরে এল। ফিরে এসে আবার একবার আঙটিটা দেখল। তারপর জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পাশেই ভবানীবাবুদের বাড়ি। জানলায় দাঁড়ালে পাশের বাড়ির দেওয়াল ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। বরং উলটো দিকের জানলায় দাঁড়ালে নীচের গলি চোখে পড়ে।

এই বাড়িটার সবই আছে; কিন্তু বড় চাপা। আকাশ দেখতে হলে ছাদে উঠতে হয়। ছাদে শিশির টব সাজিয়ে বাগান করেছিল, শখ মিটে যাবার পর টবগুলো পড়ে আছে। আবার বাগান করলে হয়।

বাড়িটা মাঝে-মাঝে বড় ফাঁকা লাগে। বাবা আর শিশির। শিশিরের এক দিদি আছে। সেই দিদি আর জামাইবাবু এখন বিলেতে। জামাইবাবু কার্ডিফে। আসছে বছর ফিরবে। দিদির শ্বশুরবাড়ি এস্টালিতে। দিদি কলকাতায় থাকলে মাঝে-মাঝে এ-বাড়ি চলে আসে। তখন বেশ জমে যায়।

সকালের দিকটা শিশিরের মন্দ কাটে না। শরীর ভাল থাকে। বন্ধুবান্ধবরাও আসে। আজও জগন্নাথ আর বিশ্ব এসেছিল। জগন্নাথ মালদা যাবে বলছিল। আসছে হপ্তায়।

শিশির বিছানায় এসে বসল। মাথার যন্ত্রণা এখন কিছুক্ষণ কম থাকবে। তারপর আবার বাড়বে। দেখতে-দেখতে সেই ঘোর আসবে। কাঁপুনি আসবে। কাঁপুনি থামতে না থামতেই ঘাম। আর তার পরই অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য সেই সব দৃশ্য শিশিরকে দেখতে হবে। হয় আলমারি উঠে যাচ্ছে উঁচুতে, না হয় জিমি বিরাট হয়ে যাচ্ছে, অথবা বাতাসে কিছু ভেসে বেড়াচ্ছে, জানলার পাল্লা নরম হয়ে গলে যাবার মতন বেঁকে যাচ্ছে, বিদঘুটে সব দৃশ্য।

কেন এইসব দেখে শিশির? মানুষ নেশাভাঙ করলে অবাক-অবাক জিনিস নাকি চোখে দেখে। শিশির পান সিগারেট পর্যন্ত খায় না। তার মাথার গোলমালও নেই। কিন্তু এ-রকম চলতে থাকলে সত্যিই পাগল হয়ে যাবে শিশির।

আঙটিটার দিকে আবার তাকাল শিশির। দেখা যাক, আজ কী হয়।

(ক্রমশ)

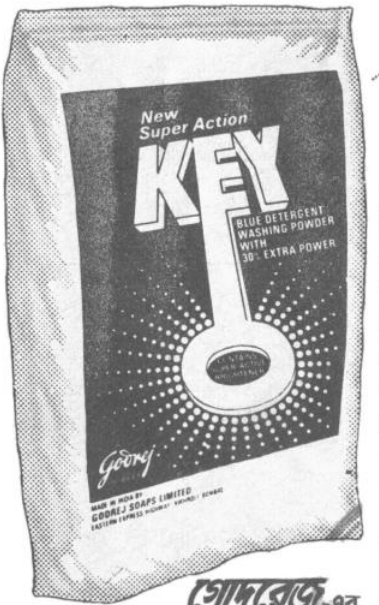

গত বছরে কী দিয়ে
সব ধরনের কাপড়
ঘরেতেই ধুয়ে আমি
১০০/- টাকা বাঁচিয়ে ফেলেছি !
কী
অন্যান্য নামী
ডিটারজেন্টের
চেয়ে
দামে ৩০% কম !
New
Super Action
KEY
BLUE DETERGENT
WASHING POWDER
WITH
30% EXTRA POWER
Godrej
GODREJ SOAPS LIMITED
দারুণ কার্যকরী কী গরম, ঠাণ্ডা—দু'রকম জলেতেই চটপট গুলে গিয়ে রাশি রাশি ফেনা তৈরী করে, যা কাপড়ের সব ময়লা নিংড়ে ধুয়ে কাপড় চমৎকার পরিষ্কার করে ফেলে।
দারুণ সাদা করার ক্ষমতাসম্পন্ন কী আপনার কাপড়কে করে তোলে ধবধবে সাদা, ঝলমলে উজ্জ্বল। কারণ, এর মধ্যে রয়েছে কাপড় দারুণ সাদা ও উজ্জ্বল করার বিশেষ এক কার্যকরী উপাদান।
দারুণ সাশ্রয়কর কী পাওয়া যায় ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কিলো ও ২ কিলোগ্রামের প্যাকে।
দারুণ-কার্যকরী।
দারুণ-সাদা করার শক্তি।
দারুণ-সাশ্রয়কর।
কী
ব্লু ডিটারজেণ্ট
পাউডার
গোদরেজ-এর
উৎপাদন
CHAITRA ·.·137 BEN

॥ ৯ ॥

বিহারের বিরুদ্ধে বাংলার হয়ে মাঠে নামলেন এই এগারো জন : ভরদ্বাজ, পি বড়ুয়া, শৈলেন মান্না, গোকুল, চন্দন সিং, মহাবীর, রবি দাস, সাত্তার, মেওয়ালাল, রঞ্জিত বসু এবং এস (কেষ্ট) দত্ত। আমেদ এবং বেঙ্কটেশ তখন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে রাশিয়ায় গেছেন।

এখনকার ইস্টবেঙ্গল-এরিয়ান মাঠে খেলা। উত্তর-পূর্ব দিক বানের জলে ভর্তি। প্রথম দশ মিনিট বাংলা বিহারকে দাঁড়াতেই দিল না। আমাদের ডিফেন্সে 'গেল-গেল' রব উঠল। এরই মধ্যে মান্না একটা হেড নিলেন, দুটো ভলি মারলেন—সত্যিই দুর্দান্ত। ঠিক বারো মিনিটের মাথায়, চন্দন সিং আর মান্নাদার মাঝখান দিয়ে পরেশ চ্যাটার্জি একটা লম্বা পাস বাড়ালেন। বল উঁচু হয়ে আমার অন্তত তিরিশ গজ দূরে সামনে পড়ছে। মহাবীর, মান্নাদা আমাদের চেয়ে বলের আরো সাত-আট গজ কাছে। একবার ভাবলাম, দৌড়ে কী হবে? তারপর কী ভেবে জানি না, দৌড়তে শুরু করলাম। বল যখন দশ গজ দূরে, মহাবীরকে ছাড়িয়ে মান্নাদাকেও ধরে ফেলেছি। হঠাৎ স্পীড তুলে মান্নাদাকে ছাড়িয়ে বলের কাছে পৌঁছে গেলাম। বুক দিয়ে বল নিতে গিয়ে দেখি মান্নাদা বলের কাছে এসে পড়েছেন। ডান পায়ে মান্নাদার মাথার ওপর দিয়ে বল তুলে নিতেই মান্নাদা ঘুরে ট্যাকল করতে এলেন। বাঁ পায়ে আবার বল তুলে নিলাম মান্নাদার মাথার উপর দিয়ে। ততক্ষণে অন্য ডিফেন্ডাররাও এসে পড়েছে। চকিতে স্পীড নিয়ে গোল লাইনে পৌঁছে ব্যাক সেন্টার করলাম। বিহারের দুর্ভাগ্য, নিশ্চিত গোলটি সুধীর টার্কি করতে পারলেন না। এদিকে মাঠের দর্শকেরা তখন আমার প্রশংসায় হাততালিতে ফেটে পড়েছেন। সতেরো বছরের একটা ছেলে শৈলেন মান্নাকে টপকে যেতে পারে, এটা কেউই ভাবতে পারেননি। এর পরেই মহাবীর আমাকে বললেন, "ছুরি মেরে শেষ করে দেব!" কত বড় হাফ ছিলেন মহাবীর, তা না দেখলে বোঝা কঠিন। সেন্টার হাফ চন্দন সিংও বিরাট ফুটবলার ছিলেন। আমার মনে হয়, আধুনিক ফুটবলের চার-তিন-তিন প্রথায় মাঝ - মাঠে চন্দন সিং দারুণ খেলতে পারতেন। তবে মহাবীর গেম-মেকার হিসেবেও খুব বড় ছিলেন। কাউকে রোখার জন্য তাঁর ছুরি মারার প্রয়োজন হত না! নেহাতই বাচ্চা ছেলেকে ভড়কে দেওয়ার জন্য বলা। বুঝতেই পারছ, কলকাতার হালচাল তখন কিছুই জানতাম না। তাই খুব ভয় পেয়ে ব্যাপারটা হাফ - টাইমে মান্নাদাকে বললাম। মান্নাদা প্রথমার্ধে একাধিকবার

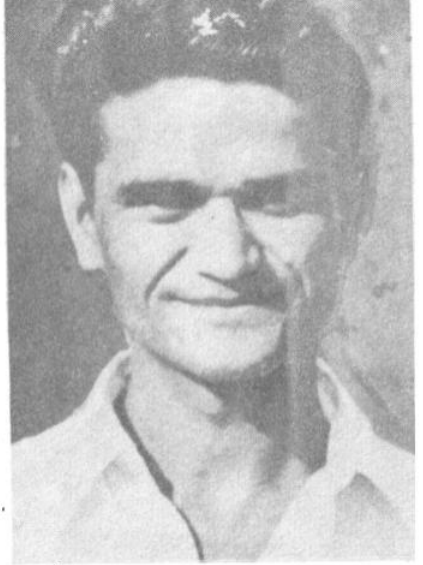

চন্দন সিং

পরাস্ত হয়েছেন। এই অবস্থায় অন্য কোনো দিকপাল ফুটবলার নিশ্চয় অসন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি কিন্তু বললেন, "এই মহাবীর, এসব কী হচ্ছে?.....আর শোনো ভাই, তুমি একটুও ভয় পেয়ো না। ভাল খেলছ, খেলে যাও।" মহাবীর চোখ টিপে দূরে সরে গেলেন।

হাফ টাইমের আগেই মেওয়ালাল বাংলাকে এক গোলে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কর্নার কিক থেকে নিখুঁত ফ্লিকে চমৎকার গোল। দ্বিতীয়ার্ধে বিহার নতুন উদ্যমে খেলা শুরু করল। সুধীর টির্কি এবং সুনীল ঘোষ ক্রমাগত আক্রমণ গড়ার চেষ্টা করে গেলেন। কিন্তু মহাবীর দারুণভাবে রুখে দেওয়ায় পরেশ চ্যাটার্জি আর আমার দিকে বল বাড়াতে পারলেন না।

খেলা শেষ হতে তখন মিনিট পাঁচেক বাকি। বাংলার আক্রমণের মুখে আমাদের রাইট ব্যাক ঠাকুর বল পেয়েই নিজেদের পেনাল্টি বকসের কোনায় আমাকে দিল। সামনে বল ঠেলে দৌড় শুরু করলাম। কেষ্ট

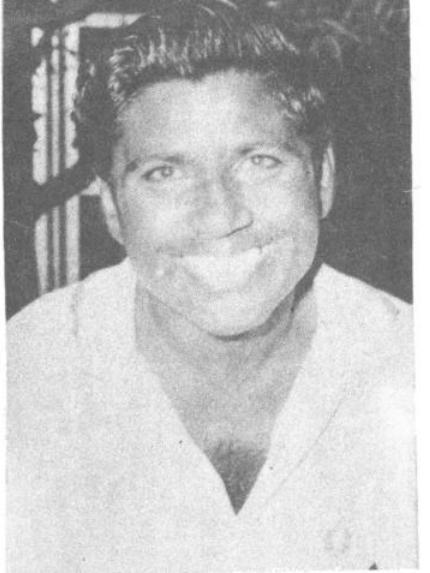

মেওয়ালাল

দত্তকে আউট সাইড ডজে এবং রঞ্জিত বসু আর মহাবীরকে ইনসাইড ডজে ফাঁকি দিয়ে মাঝমাঠে পৌঁছে গেলাম। চন্দন সিং ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁকে টপকে মান্নাদাকেও কাটিয়ে নিলাম। চন্দন সিং আবার ফিরে এসে ট্যাকল করলেন। আবার কাটিয়ে প্রায় গোল লাইনে পৌঁছে গেলাম। ঐ দূরত্ব কোণ থেকে গোলে শট না নেওয়াই হয়তো ভাল। তবু শট নিলাম। আউটসাইড সোয়াভ করে বল গোলে ঢুকে গেল। ভরদ্বাজ সম্পূর্ণ পরাস্ত হলেন। দর্শকদের লম্বা হাততালি মিলিয়ে যাবার আগেই খেলা শেষ হয়ে গেল।

মাঠ থেকে এমব্যাসি হোটেল, বিহারের সমর্থকরা প্রায় কাঁধে করেই নিয়ে গেলেন। হোটেলে এসে কে প্রসাদ বললেন, "কী, বলেছিলাম কিনা।"

দ্বিতীয় দিনেও ফয়সালা হল না। খেলা গোলশূন্য থাকল। এই দিন মান্নাদা খেলার ধরন পালটে একেবারে পিছন থেকে খেললেন। তাঁর খেলা দেখে বুঝলাম, স্ট্র্যাটেজি কাকে বলে। এবং আরো বুঝলাম, বড় ফুটবলার এক ভুল দু' দিন করে না। তবু খেলার শেষ দিকে মান্নাদাকে কাটিয়ে একটা ভাল ব্যাক সেন্টার করতে পেরেছিলাম। কিন্তু সুশীল ঘোষের পক্ষে ভরদ্বাজকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়নি।

তৃতীয় দিন মেওয়ালালের বিকল্প সেন্টার ফরোয়ার্ড ধনরাজের গোলে প্রথমার্ধেই বাংলা এক গোলে এগিয়ে গেল। দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের সুনীল ঘোষ দুর্দান্ত গোল করে ১—১ করলেন। এইদিনও খেলা ড্রয়ের দিকেই যেত, যদি-না শৈলেন মান্না নামে একজন ফুটবলার মাঠে থাকতেন। খেলা শেষ হবার ছ-সাত মিনিট আগে বাংলা একটা ফ্রি-কিক পেল। আমরা দেওয়াল তুলে দাঁড়ালাম। অন্তত আট ফুট ইনসুইং করিয়ে বল গোলে পাঠালেন ফ্রি-কিকের রাজা মান্নাদা। প্রায় পঁয়ত্রিশ গজ দূর থেকে নেওয়া ঐ অনবদ্য ফ্রি-কিকটি যেন এখনো চোখের সামনে ভাসছে।

সন্তোষ ট্রফি থেকে বিদায় নিলেও কলকাতার ক্রীড়ানুরাগীদের উষ্ণ অভিনন্দন কুড়িয়ে গেলাম আমরা। কিছুদিন বাদেই আই এফ শীল্ডে খেলার জন্য জামশেদপুর একা-

দশের হয়ে কলকাতায় এলাম। প্রথম ম্যাচে প্রচণ্ড মার খেয়েও রেঞ্জার্স ক্লাবকে ২—১ গোলে হারালাম। গোল করলাম দুই উইঙ্গার—আমি এবং সুনীল ঘোষ। দ্বিতীয় ম্যাচে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে দেখা। সবাইকে চমকে দিয়ে আমরা জিতে গেলাম ২—০ গোলে। মহামেডানের গোলে ছিলেন এখনকার বিখ্যাত কোচ গোলাম মহম্মদ বাসা। দুটি গোলই করলেন সেন্টার ফরোয়ার্ড ভগবতী। এর পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট। ওদের টীমে তখন সম্মুগম, বসির আর জেসুদাসের মতো কুশলী খেলোয়াড়রা ছিলেন, তবু আমরাই জিতে গেলাম পরিষ্কার দু গোলে। জেসুদাসের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে বাঁ পায়ের প্রচণ্ড শটে প্রথম গোল করার পর দ্বিতীয় গোলটা করেছিলাম ডজ করতে করতে অনেকখানি ছুটে গিয়ে। হ্যাটট্রিক করার সুযোগও এসেছিল। কিন্তু ডান পায়ের শট গোলকীপার বি অ্যান্টনিকে পরাস্ত করেও বারের নীচে লেগে ফিরে এল। এই ম্যাচটি আমাকে উঠে আসার ব্যাপারে বেশ কিছুটা সাহায্য করল। এক বিখ্যাত ক্রীড়া-সাংবাদিক পরদিন দৈনিক পত্রে লিখলেন, এই ছেলেটিকে অবিলম্বে ভারতীয় দলে নেওয়া উচিত।

সেমি-ফাইনালে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়া কালচার লীগের সঙ্গে খেলা ১—১ ড্র থাকল। ভিড়ের মধ্যে থেকে ভলি নিয়ে ভারত বিখ্যাত গোলকীপার সঞ্জীবকে পরাস্ত করে গোল করতে পেরে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। তবে সব আনন্দ মুছে দিয়ে রিপ্লেতে ইণ্ডিয়া কালচার লীগ জিতে গেল ৩—০ গোলে। আমরা দাঁড়াতেই পারলাম না।

জামশেদপুরে ফিরে আসার আগে মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল দুই টেন্টেই গেলাম। শ্রদ্ধেয় কর্মকর্তা জ্যোতিষচন্দ্র গুহ খবর পাঠালেন, তিনি আমাকে ইস্টবেঙ্গলে নিতে চান। এদিকে হাওড়া ইউনিয়নের হেমন্ত দে-র চিঠি নিয়ে অনিল দে জামশেদপুরে হাজির হয়ে মোহনবাগানে খেলার জন্য অনুরোধ করলেন। ইস্টবেঙ্গলের রাইট উইঙ্গার তখন ভারত-শ্রেষ্ঠ বেঙ্কটেশ। তাই বাবা মোহনবাগানে খেলার দিকেই মত দিলেন। (ক্রমশ)

হঠাৎ ওঠে কেঁপে

প্রদীপকুমার চক্রবর্তী

কাকু ভাল, জেঠু ভাল,
ভাল আমার মামা,
জন্মদিনে তাই সে কিনে
দেয় আমাকে জামা!
পিসি মজার গল্প শোনায়
কোলের পরে রেখে,
দুধ-মাখা-ভাত খাওয়ায় রোজই
আমায় ডেকে ডেকে!
মাসি আমার বড্ড ভাল,
বেড়ায় নিয়ে ছাতে,
রোজ দুপুরে পুতুল খেলে
মাসিই আমার সাথে!
দিদি আমার নয়কো খারাপ,
শোনায় মজার গান,
কাকি আমায় তেল মাখিয়ে
দেয় করিয়ে স্নান!
আমার কাছে খারাপ কেবল
আমার রাঙা-দাদা,
দাদা-ই শুধু আমায় মারে,
আমায় বলে, গাধা!
তাইতো আমি চাইনে যেতে
দাদার কাছে মোটে,
ডাকলে দাদা তাইতো গা'টা
হঠাৎ কেঁপে ওঠে।

ছবি : দেবাশিস দেব

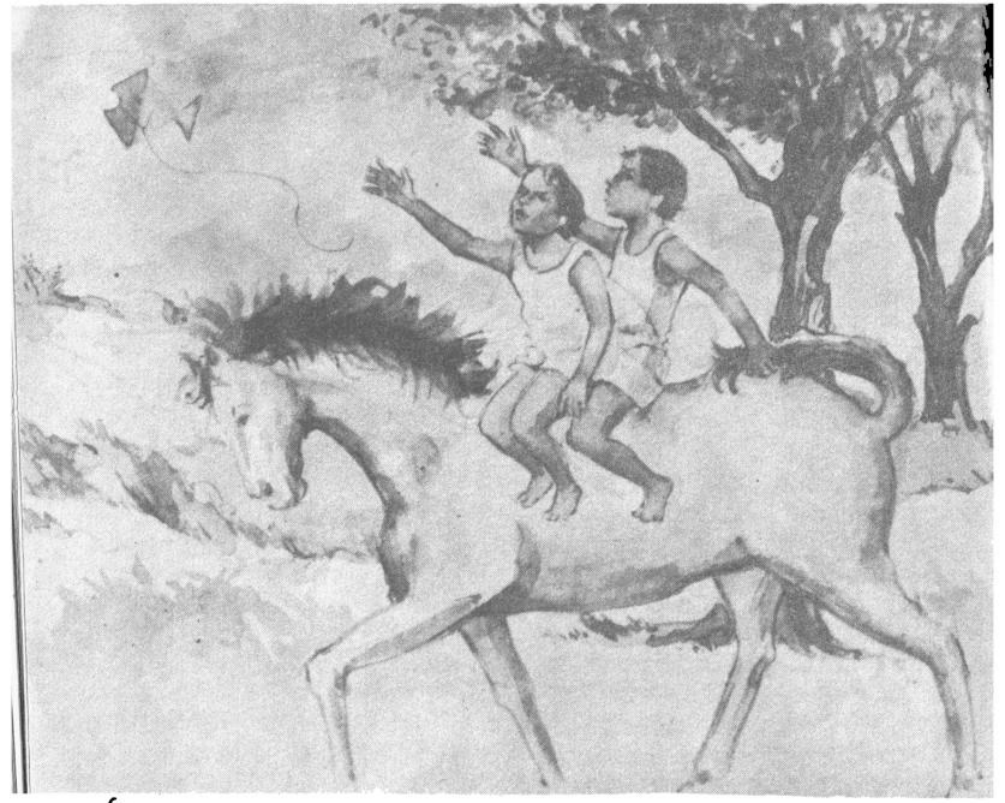

টুম্পার বন্ধুরা

আশিস ঘোষ

আজ রবিবার। টুম্পা বলছে, চিড়িয়াখানায় যাবে।

বাবা বললেন, "আজ নয়, আর একদিন।"

চুপ করে যায় টুম্পা। কী আর করবে। মুখ গোমড়া করে বসে থাকে। বড়দিনের ছুটি। দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চেয়ে থাকে।

ইচ্ছে করেই খেলতে বেরুল না। যাবে না। কোথাও যাবে না। পড়ার টেবিলে বসে, একটা ছবির বইয়ের পাতা উলটে যায় টুম্পা। চিড়িয়াখানার ছবি। খরগোশ, রাজহাঁস, সীল মাছ, হনুমান, সাদা ঘোড়া—এইসব। চিড়িয়াখানায় তো যাওয়া হল না। মন দিয়ে টুম্পা তাই ছবিগুলোই দেখতে থাকে।

সন্ধে হতেই বাবা সেজেগুজে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই মা বললেন, "টুম্পা, আমিও বেরুচ্ছি। বাড়ি ফাঁকা রেখে কোথাও যেও না যেন।" মাকে একবার দেখল টুম্পা। তারপর কোনও কথা না বলে ছবিতে মন দিল।

বাড়িতে টুম্পা এখন একা। কিছুই করার নেই, তাই বসে বসে ছবি দেখছে। কিন্তু কতক্ষণ আর ছবি দেখতে ভাল লাগে? দেখছে তো প্রায় বিকেল থেকেই। ছবির বইটা টেবিলে রেখে চেয়ারে গা এলিয়ে দেয় টুম্পা। ভাল লাগছে না। মাথাটা কেমন ভার-ভার। চোখ বন্ধ করতেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল কে জানে! হঠাৎ

ঘুম ভেঙে যায়। কী ব্যাপার? শব্দ হচ্ছে কেন? ফাঁকা বাড়িতে একা-একা একটু ভয় পায় টুম্পা। কিন্তু কতক্ষণ আর এভাবে বসে থাকা যায়? দেখাই যাক না। আস্তে আস্তে উঠে পাশের ঘরের দরজা খোলে।

এ কী! এরা কোত্থেকে এল? টুম্পা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। বইতে যাদের ছবি দেখছিল তারাই বই থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঐ তো সাদা খরগোশটা দু'পা তুলে টেবিলের নীচে বসে। একটা রাজহাঁস প্যাঁক-প্যাঁক করতে-করতে বাথরুমের দিকে গেল। বাথটাবে ছোট-ছোট কয়েকটা সীল মাছ হঠাৎ লাফালাফি শুরু করল। টুম্পা অবাক হয়ে দেখে। কয়েক পা এগিয়ে খরগোশকে বলে, "এই, এখানে তোমরা কী করছ?"

খরগোশ লাফিয়ে-লাফিয়ে টুম্পার চারদিকে ঘুরতে থাকে।

কিচ্‌কিচ্—বইয়ের আলমারিটার ওপর শব্দ হয়। এ আবার কে? ওপর দিকে চাইতেই কালো-মুখ সাদা-দাড়ি একটা হনুমান চোখ পিট-পিট করে। টুম্পা না হেসে পারে না।

"হাসছ যে বড়?" হনুমান ভেংচি কেটে বলে, "খেলবে আমাদের সঙ্গে?"

টুম্পা মাথা নাড়তেই রাজহাঁস প্যাঁক-প্যাঁক করতে-করতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। সীল মাছেরা বাথটাবে আবার লাফালাফি শুরু করে। সাদা খরগোশ ঘরের এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে থাকে।

তারপর? তারপর খেলা, হৈ-চৈ।

হঠাৎ বইয়ের আলমারির পেছনে শব্দ। টুম্পা থমকে দাঁড়ায়। "কে, কে ওখানে?"

একটু এগিয়ে আলমারির পেছনে উঁকি দিতে যাবে, সাদা একটা ঘোড়া বেরিয়ে আসে। খটখট করে টুম্পার সামনে এসে দাঁড়ায়। এক পা তুলে আবার নামিয়ে নেয়।

"তুমি, তুমি তো ছবিতে ছিলে?"

মাথা নাড়ে সাদা ঘোড়া। দু'পা তুলে দাঁড়ায়। "আমাকে খেলায় নেবে না?"

টুম্পা অবাক হয়ে বলে, "তুমি কী খেলবে? তুমি তো একটা ঘোড়া!"

সাদা ঘোড়া মাথা ঝাঁকায়। "কেন, আমি তো ছুটতে পারি। সবার চাইতে জোরে ছুটতে পারি। দেখবে?" বলেই ঘরের চারদিকে ছুটতে থাকে। চার পা তুলে লাফায়। টুম্পা হাসতে থাকে। সাদা ঘোড়া লাফাতে থাকে।

"এই, থামো থামো। এইটুকু ঘরে এভাবে ছুটো না।"

সাদা ঘোড়া মাথা ঝাঁকায়। "পিঠে একবার উঠেই দেখ না। সুট্ করে জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাব।"

টুম্পা সবার দিকে তাকায়। খরগোশ, রাজহাঁস, হনুমান—সবাই তার দিকেই চেয়ে আছে। ওরা যেন বলতে চাইছে, টুম্পা যেও না। যেও না। এখানেই আমরা খেলা করব।

সাদা ঘোড়া আবার মাথা ঝাঁকায়। "কই, এসো!"

এক লাফে টুম্পা সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। "কত জোরে ছুটতে পারো?"

"হাওয়ার মতো।"

টুম্পা সাদা ঘোড়ার পিঠের চুল ধরে নেড়ে দেয়। "বেশ, চলো তো দেখি।"

সাদা ঘোড়া পা ঠুকে বলে, "আমার লেজটা ধরে থাকো।" হাত বাড়িয়ে লেজটা ধরে হাঁস, খরগোশ, হনুমানদের দিকে চেয়ে টুম্পা বলে, "আসছি ভাই। তোমরা খেলতে থাকো। আমি এলাম বলে।"

বলতে বলতেই জানলা দিয়ে সাদা ঘোড়া সুট্ করে বেরিয়ে যায়। তারপর ছুট ছুট। রাস্তা পেরিয়ে, টুম্পাদের স্কুল-বাড়ি পেরিয়ে—দূরে—অনেক দূরে—

ছুটতে ছুটতে সকাল হয়ে গেল। ছোট্ট একটা ছেলে রাস্তার পাশে বসে কাঁদছিল। সাদা ঘোড়াকে থামতে বলে টুম্পা। "এ কী, তুমি কাঁদছ?"

ছেলেটা কিছু বলে না। কাঁদতেই থাকে।

টুম্পা আবার বলে, "বলো না, কাঁদছ কেন?"

ছেলেটা এবার হাত তুলে ওপর দিকে দেখায়। "ঐ যে, আমার ঘুড়িটা কেটে গেছে। কী সুন্দর ঘুড়িটা!" ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে ছেলেটা।

"এই ব্যাপার!" টুম্পা সাদা ঘোড়ার দিকে ফিরে চায়। সাদা ঘোড়া মাথা দুলিয়ে

বলে, "আমার পিঠে ওঠো। এক ছুটে ঘুড়িটা ধরে ফেলব।"

আর দেরি করে না টুম্পা। ছেলেটাকে নিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়ে। তারপর লেজ ধরে এক মোচড়। ব্যস, ছুট—ছুট। দেখতে-দেখতে ওরা ঘুড়ির কাছে পৌঁছে যায়। হাত বাড়িয়ে ঘুড়িটা ধরে ফেলে টুম্পা। ছেলেটা খুশিতে হাততালি দিয়ে ওঠে। "কী মজা, কী মজা!"

ঘুড়িটা ওকে ফেরত দেয় টুম্পা। ঘোড়া আবার মাটিতে নেমে আসে। হাত নেড়ে টুম্পা বলে, "চলি বন্ধু, আবার দেখা হবে।"

ছেলেটাও হাত নাড়তে-নাড়তে ঘুড়ি নিয়ে বাড়ির দিকে ছোটে। সাদা ঘোড়া আবার চলতে থাকে। নদী—পাহাড়—সমুদ্র—কত শহর! ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছেই। যেতে-যেতে ওরা একটা শহরে পৌঁছে যায়। এ এক অদ্ভুত শহর। রাস্তার দুপাশে আলো। লাল, নীল, সবুজ—কত রকমের। জ্বলছে নিবছে, নিবছে জ্বলছে। ওদের ছায়া কখনও ছোট হয়ে যাচ্ছে, কখনও ভেঙে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে। কিন্তু সমস্ত শহর ঘুরেও মানুষজন চোখে পড়ল না। টুম্পা অবাক হয়ে চারদিকে দেখতে থাকে। একটু ভয়ও করছে। ঘোড়াকে জিজ্ঞেস করে টুম্পা, "কোথায় এলাম ভাই?"

থমকে দাঁড়ায় সাদা ঘোড়া, "জানো না? এ হচ্ছে ঘুমের দেশ।"

"কাউকে দেখছি না কেন?"

চলতে চলতে সাদা ঘোড়া বলে, "ঘুমের দেশে কাউকে দেখবে কী করে? সবাই তো ঘুমিয়ে আছে। ওরা ছ'মাস ঘুমোয়, ছ'মাস জেগে থাকে।"

"বাঃ, বেশ মজা তো!"

মাথা নাড়ে সাদা ঘোড়া। "না, মজা নয়। কেউ যদি ছ'মাসের আগেই ঘুম থেকে জেগে ওঠে তো, তার কী হবে জানো?"

"কী?"

"সে ছায়া হয়ে যাবে। ঐ যে সব ছায়া দেখছ, ওরা ছ'মাসের আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল।"

খুব ঘাবড়ে যায় টুম্পা। সত্যিই তো। ছায়ারা কেমন নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আহা রে!

টুম্পা কোনো কথা বলে না। এবার ক্লান্ত লাগছে। সেই কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। বাড়ি ফাঁকা। মা বাড়িতে থাকতে বলেছিলেন। আর সে কিনা—

"ভাই এবার ফেরা দরকার।"

"কেন?"

"বাবা-মা বাড়ি ফিরে দেখবেন, আমি নেই। চিন্তা করবেন।"

"নীল সমুদ্রের সবুজ দ্বীপে যাবে না?"

"না-না। আজ নয়, আর-একদিন।"

অগত্যা সাদা ঘোড়াকে ফিরতেই হয়। আবার পেছন ফিরে ছুট, ছুট। দেখতে না দেখতে ওরা বাড়ির কাছে এসে পড়ে। ডলি—মলিদের বাড়ি। বাপটুদের বাড়ির ছাদ। ঐ তো, টুম্পাদের ঘরে এখনও আলো জ্বলছে। বাবা কি ফিরেছেন? মা চলে এসেছেন?

সাদা ঘোড়া জানলা দিয়ে টুক করে ঢুকে পড়ে। ঢুকেই পা ঠুকে-ঠুকে ঘরময় হাঁটতে থাকে। খরগোশ, হনুমানরা আনন্দে ছুটো-ছুটি শুরু করে। "কী মজা, আবার খেলা শুরু হবে!"

হনুমান মুখ নেড়ে বলে, "টুম্পা আমার দলে!"

খরগোশ দু'পায়ে দাঁড়ায়, "না, না—আমার দলে!"

সীল মাছেরা বাথটাবের জলে দাপাদাপি করতে থাকে।

কিন্তু ঘুম পাচ্ছে টুম্পার। সারাদিন তো কম ধকল যায়নি। টুম্পা কাউকেই কিছু বলে না। বিছানায় শুয়ে পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম।

দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় টুম্পার। প্রথমে মা এলেন। তারপর বাবা। টুম্পা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কোথায় ছিল সে? ওঁরা যদি জানতে পারেন! পাশের ঘরে খরগোশরাই বা কী করছে? বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে টুম্পা। পাশের ঘরে ছুটে যায়। কই, কেউ তো নেই! গেল কোথায়? টেবিলে, আলমারিতে, খাটের নীচে, বাথরুমে—কোথাও কিছু নেই! ছবির বইটা শুধু মেঝেয় পড়ে আছে। ফর-ফর করে পাতা উড়ছে। তাহলে? এতক্ষণ কি ও স্বপ্ন দেখছিল?

ছবি মদন সরকার

কমই যখন বেশি

কুন্তক

খুবই কম কথা বলছ আজকাল, কাকু। অনেকদিন তোমার সাড়া নেই।

নন্তু বলল : অলংকারের সেরা অলংকার হয়ে গেছে এবার।

বাজে বকিস না। আমি এখন ভাবছি।

কী ভাবছ গো কাকু? —এগিয়ে আসে টুম্পি।

ভাবছি এবার পুজোর কোন কোন ছড়া তোর ভাল লাগতে পারে।

কী কাণ্ড! এর জন্যে এত ভেবে মরছ কেন? আমাকে জিজ্ঞেস করলেই পারো। বলব একটা-একটা করে? এই যেমন ধরো, এই ঝড়বৃষ্টির ছড়াটা।

কার লেখা?

কার? আলোক সরকার। 'ব্রহ্মদৈত্য বলে/ তাল দিচ্ছেন আকাশঠাকুর/মুখ ঢেকে কম্বলে।' সুন্দর না লাইনগুলি?

তারপর?

তারপর, 'নিকষ কালো কম্বলের/ মাঝে-মাঝেই জরি। ঝলমলানো সোনার ঝালর/ কত হাজার ভরি।'

নন্তু জিজ্ঞেস করল : কিসের কথা হচ্ছে বল তো টুম্পি।

আহা, জানি না যেন। মেঘের কথা। বিদ্যুতের কথা।

বা রে, কোথায় আছে এর মধ্যে মেঘ-বিদ্যুৎ?

নেই? কম্বলটা তবে কী? আকাশের কি আর কম্বল হয়? ঝলমলানো জরি আসছে কোত্থেকে? কম্বলের কি আর জরি হয়?

না যদি হয় তো লেখে কেন লোকে? বাজে কথা না?

মোটেই বাজে কথা না। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি ছবিটা। তোমার যদি বাজে মনে হয় তো তুমি চুপ করে থাকো। কাকু বলো তো, এ কি বাজে কথা?

বাজে কেন হবে? নন্তু তোকে খ্যাপাচ্ছে নিশ্চয়। ঠিকই তো, মেঘবিদ্যুতেরই তো কথা। কিন্তু সেটা যে দিব্যি চেপে যাওয়া হয়েছে, তাও তো ঠিক। মিলটাকে চেপে

রেখেই মেলানো হল। একাকার হয়ে গেল মেঘ আর কম্বল। এই তো সেই কম কথা বলার ব্যাপার। আমি কি আর কথা বলছি, তোর ছড়াই বলছে কম করে।

ও, তার মানে এখানেও আছে অলংকার? এরও কি কোনো নাম আছে কাকু?

নাম তো একটা থাকতেই হবে। তবে, এ নামটা বেশ মজার। একে বলে অতিশয়োক্তি।

নন্তু বলল : কী এমন মজার হল? এতে তো আমি কিছুই মজা পাচ্ছি না।

ভাবছিস না, তাই পাচ্ছিস না। বলা হচ্ছে কম করে, কিন্তু নাম হল অতিশয়! গোলমেলে ব্যাপার নয়?

ও, তুমি গোলমালের মধ্যেই মজা দেখছ আজকাল?

সে-কথায় কান না দিয়ে টুম্পি বলে : সত্যি তো। কিন্তু কেন ওই নাম হল কাকু?

কেন হল তাও বুঝতে পারবি, একটু ভাবলে। দুটো জিনিসের মধ্যে মিল দেখাতে দেখাতে এমন অবস্থা হল না যেন দুটো আর নেই? যেন একটাই আছে। একটা অন্যটাকে গিলে ফেলল না একেবারে? বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? সেইজন্যেই 'অতিশয়'।

বলো দেখি এ-রকম আরেকটি 'উক্তি'।

বলব? মনে আছে সত্যেন দত্তের 'সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়/চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়'?

খুব মনে আছে। বিদ্যাসাগরের কথা তো?

কথা তো বিদ্যাসাগরের। কথা তো তাঁর চরিত্রতেজের। কিন্তু বলা হল কেবল সাগরের কথা, বলা হল শুধু আগুনের কথা। তাই না?

মাথা নাচিয়ে টুম্পি বলল : বুঝেছি, কমটাই তবে বেশি!

(ক্রমশ)

ছোটদের যত সেরা বই

শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর সৃষ্ট চরিত্র হর্ষবর্ধনের মতোই, নিত্য নতুন। বাংলা সাহিত্যের হাসির গল্পের ক্ষেত্রে তিনি এক যুগ, এক চিরকালীন-চিরনবীন প্রতিষ্ঠান। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তিনি নেই। শেষ দিকে তিনি কমই লিখেছেন। তবু সৌভাগ্য বলব যে, কিছু-কিছু স্মরণীয় গল্প অসুস্থতার মধ্যেও লিখে গেছেন। সেইরকম কিছু গল্প নিয়েই তাঁর নতুন বই 'লাভের বেলায় ঘণ্টা।' হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধনকে নিয়ে লেখা গল্প যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে নানান মজাদার পরিস্থিতির তীব্র কৌতুককর কাহিনী। প্রতিটি গল্প হাসি-জাগানো, প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র অনাবিল হাসির অনিঃশেষ উৎস।

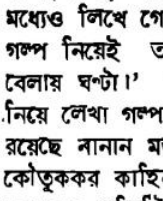

পূর্ণেন্দু পত্রী কলকাতা নিয়ে লিখেছেন তিনখানা আশ্চর্য বই। একটিতে তিনি শুনিয়েছেন এই শহর কলকাতার গড়ে ওঠার কাহিনী। নাম, 'কী করে কলকাতা হলো।' অরেকটিতে 'ছড়ায় মোড়া কলকাতা'য় শুনিয়েছেন কলকাতাকে নিয়ে চলতি বহু ছড়ার পিছনের কাহিনী, গল্পগাথা আর ইতিহাস। তাঁর নতুন বই 'কলকাতার রাজকাহিনী।' পুরনো কলকাতার পাঁচ রাজা এক রাজকুমারকে নিয়ে লেখা এই বইতে পূর্নেন্দু পত্রী শুনিয়েছেন এঁদের ঘটনা-বহুল জীবনকাহিনী। তাঁর কলমে বাসী ইতিহাস হয়ে ওঠে ফুলের মতো তাজা রূপকথার মতো মিষ্টি। প্রতিটি বইতেই দারুণ দারুণ সব ছবি।

সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য-উপন্যাস : বাদশাহী আংটি ৬ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৬ সোনার কেল্লা ৬ বাক্স-রহস্য ৬ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৬ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৬ জয়বাবা ফেলুনাথ ৬ ফেলুদা এণ্ড কোং ১০ গোরস্থানে সাবধান ৮ **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ভয়ঙ্কর সুন্দর ৬ সত্যি রাজপুত্র ৬ তিন নম্বর চোখ ৬ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৬ সবুজ দ্বীপের রাজা ৫ ডুংগা ৭ জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ ৮ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৬ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৭ তপন চরিত ৬ **প্রেমেন্দ্র মিত্রের** আগ্রা যখন টলমল ৫ যাঁর নাম ঘনাদা ৬ **শৈলেন ঘোষের** অরুণ বরুণ কিরণমালা ৪ মিতুল নামে পুতুলটি ৫ বাজনা ৬ হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৬ আমার নাম টায়রা ৫ আজব বাঘের আজগুবি ৭ **হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের** ভয়ের মুখোশ ৬ কবন্ধ বিগ্রহের কাহিনী ১০ সীমানা ছাড়িয়ে ৬ পাঁচ মুণ্ডির আসর ৭ **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের** ভূমিকম্পের পটভূমি ৪ শরদিন্দু অম্নিবাস ৪র্থ ২০ **ইন্দ্রমিত্রের** বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৬ শরৎ কথামালা ১০ **সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের** মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটনো ৬ **ডঃ শিশির-কুমার বসু ও বীরেন্দ্রনাথ সিংহর** NETAJI—A Pictorial Biography 50

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

শীতকালের ছুটির দিনের সকালে চিড়িয়াখানায় যে ভিড় জমেছে তার মধ্যে আমাদের চেনা একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। তোমরা যদি আমায় জিজ্ঞেস করো, আমি ব্যাপারটা একটু খুলে বলতে পারি।

Is there a big crowd at the zoo?

Yes, there is.

Whom do we see among the crowd?

We see our old friends Chameli and Chambal.

What time is it now?

It's 10 o'clock in the morning.

Will there be a bigger crowd in the afternoon?

Yes, there will be.

How long will Chameli and Chambal be here?

They'll be at the zoo till the evening.

একটা বাঘের খাঁচার সামনে গিয়ে চামেলি দেখল বাঘটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। চম্বল বলল ও বোধহয় ভেতরের ঘরে ঘুমিয়ে আছে।

"Perhaps it will wake up at night," Chambal said.

"Doesn't a tiger sleep at all at night?" Chameli asked.

"The tiger doesn't sleep at night unless its belly is full." Chambal told his sister.

কিন্তু চিড়িয়াখানার বাঘ?

"But a tiger in a zoo can't go hunting, can it?" Chameli said.

"No, it can't," Chambal had to admit. "But I don't think it goes to bed at eight, like you."

Chameli protested, "I never go to bed at eight!"

"Then you ought to," Chambal said gravely.

কিন্তু ততক্ষণে চামেলি অন্য কথা ভাবছে।

"Where does a tiger sleep?" Chameli was wondering.

"Has it got a bed?"

"What is the bed of a tiger made of?"

খাঁচার বাঘ নয়, বনের বাঘের কথাই তার মনে হতে লাগল।

Chameli remembered a poem that she had read.

She often remembers the lines at night, when she is in her bed, alone.

"Tiger, tiger, burning bright,

In the forest of the night!"

Lying in her bed, she thinks of the dark forest and the tiger burning in the darkness.

এবারে লক্ষ করো :

in the morning, in the afternoon, in the evening

কিন্তু আবার :

at night

ঠিক তেমনি :

going to the zoo, going to the market, going to the cinema.

কিন্তু :

going to bed, going to school, going home.

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

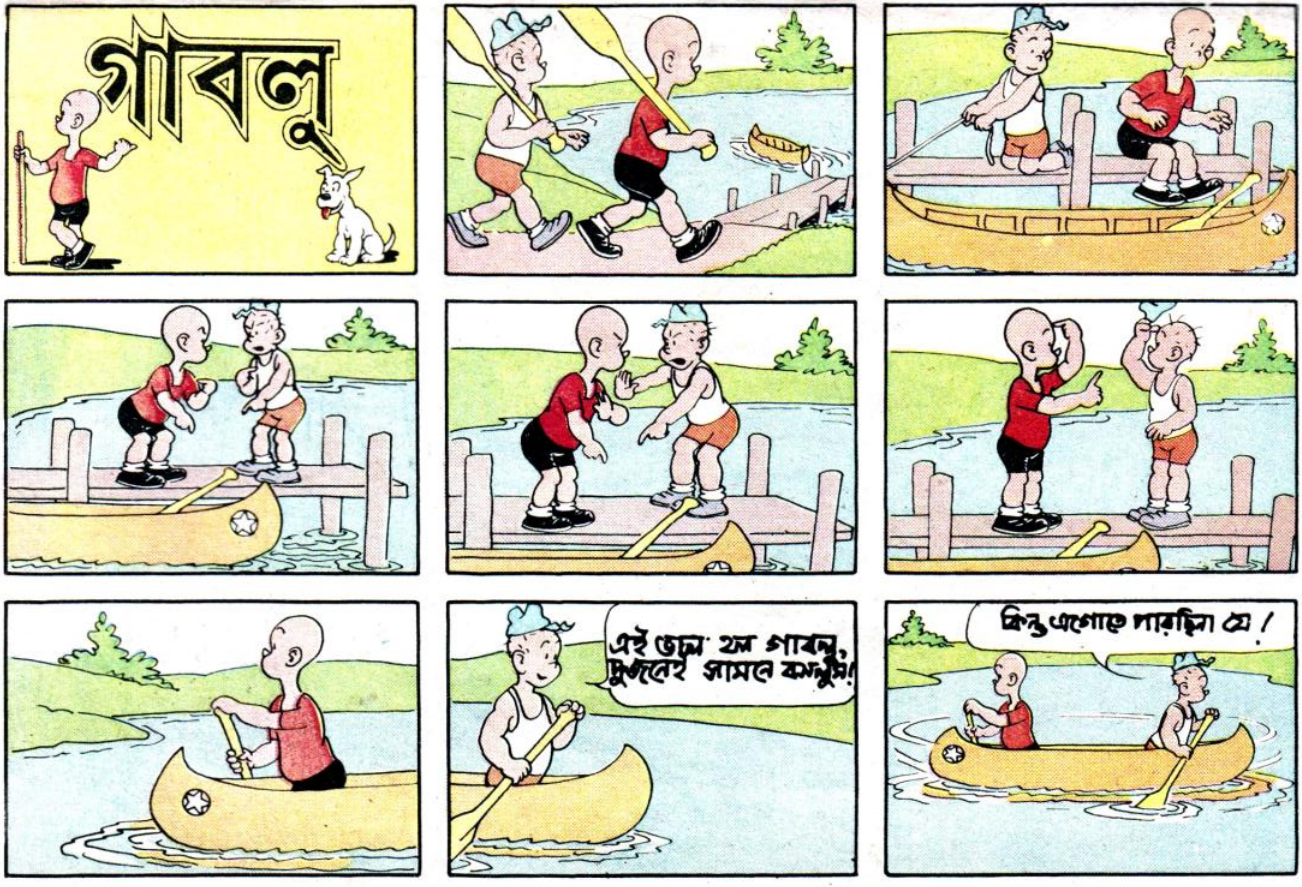

গাবলু
এই জন্য হল গাবলু, দুজনেই সামনে বসলুম!
কিন্তু এগোতে পারছি না যে!

চেতলা গার্লস হাইস্কুলের প্রধান-শিক্ষিকা কী বলেন

সাধনা মুখোপাধ্যায়

বড় রাস্তার ওপরে পার্কের কাছে দাঁড়িয়ে যাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক, সেই দেখিয়ে দেবে জয়নুদ্দিন মিস্ত্রি লেনের চেতলা গার্লস হাই স্কুলের বিশাল ভবন। কিন্তু চিরদিনই এত নামডাক ছিল না এই স্কুলের। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে একটি গোলপাতার ঘরে কয়েকটি মেয়ে নিয়ে

এই স্কুলের সূত্রপাত। ক্রমে এই স্কুল প্রাইমারি ও তারপরে মিডল স্কুল হয়ে ১৯৩৫ সালে হাই স্কুল হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পায়। সেই সময়েই তৈরি হয়েছে স্কুলের নিজস্ব পাকা বাড়ি।

প্রধান-শিক্ষিকা শ্রীমতী নিভা দাশগুপ্তর বিষয় ইংরেজি। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন। প্রথম থেকেই তিনি প্রধান-শিক্ষিকা। এই স্কুলে আছেন ছাব্বিশ বছর।

এই স্কুলের পরীক্ষার ফল ভালই হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার শতকরা ৮৫ জন ছাত্রীই পাস করে। বেশির ভাগই পাস করে দ্বিতীয় বিভাগে। প্রায় প্রতি বছরই কেউ না কেউ লেটার পায়। ন্যাশনাল স্কলারশিপও পায় মাঝে-মাঝে।

"কী ভাবে উত্তর লিখলে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়া যায়?"

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী দাশগুপ্ত বললেন, "প্রশ্নপত্রে যা চাওয়া হয়েছে সেটা বুঝে উত্তর দিতে হবে। ভাষা সরল ও সংগতিপূর্ণ হওয়া চাই। লেখার অভ্যাস বাড়াতে হবে। লেখার গতিও বাড়ানো দরকার। বানান শুদ্ধ করার দিকে ছোটবেলা থেকেই নজর দিতে হবে। শ্রুতলিপি লেখার অভ্যাস করলে ভাল হয়। বোধশক্তি বাড়ানোর জন্যে দ্রুত-পঠনের অভ্যাস করা উচিত। শুধু পড়লেই হবে না, যা পড়া হচ্ছে তা মাথায় রাখার চেষ্টা করা চাই। স্কুলের বই ছাড়াও বাইরের বই পড়া ভাল। এতে চিন্তাশক্তি বাড়ে, ভাষার ওপর দখল আসে।

"সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত পড়াশোনা করলে এবং যাঁরা পড়ান তাঁদের কথা-মতো চললে নিশ্চয়ই পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারবে। ক্লাস কামাই করলে চলবে না। কারণ, তাতে দৈনন্দিন পাঠের অভ্যাস নষ্ট হয়। ভাল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা থাকা চাই। নির্দিষ্ট বই থেকে তাদের বেশি বই পড়া উচিত।"

"কীভাবে ইংরেজি পড়তে হবে?"

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী দাশগুপ্ত জানালেন, "ইংরেজিতে উচ্চারণ যাতে ঠিক হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সাবলীলভাবে রীডিং পড়ার অভ্যাসও করা উচিত। ছোট বাক্য রচনা শিখতে হবে। ওয়ার্ড মেকিং খেললে অনেক শব্দ শিখতে পারা যায়। ডিকটেশান লেখার অভ্যাস করতে হবে নিয়মিত। বন্ধুদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যাস করাও ভাল। ছোট-ছোট গল্পের বই পড়ার অভ্যাসও খুব কাজে লাগে।"

বাংলা সম্পর্কে প্রধান-শিক্ষিকা বললেন,

"বারবার লেখা এবং পাঠ্য-বই ও বাইরের বই পড়ার অভ্যাস করতে হবে। হাতের লেখা ভাল না করলে চলবে না। কোনো বিষয় নিয়ে লেখা ও বলার অভ্যাস, কবিতা পড়ার অভ্যাস করা উচিত।"

অঙ্ক সম্পর্কে শ্রীমতী দাশগুপ্তের অভিমত—"ছোটবেলা থেকে ধারাপাত শেখা দরকার। গণিত যত বেশি অভ্যাস করা যায় ফল ততই ভাল হবে। লক্ষ রাখতে হবে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগে যেন ভুল না হয়। অঙ্কের প্রাথমিক জ্ঞান ভাল করে আয়ত্ত করতে হবে। জ্যামিতির অঙ্কনগুলো ভাল করে শেখা উচিত।

অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে শ্রীমতী দাশগুপ্ত বললেন, "বিজ্ঞান মুখস্থ দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না। প্রথম থেকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। কোথাও গোঁজামিল চলবে না, বুঝে ধাপে-ধাপে ভাল করে সবকিছু শেখা উচিত। ছবির সাহায্যে পড়লে ভাল হয়। ভূগোলে আবশ্যিক ভাবে ম্যাপ দেখে পড়া উচিত। ইতিহাসে কোনো একটি অধ্যায় পড়ে তার প্রধান অংশগুলি সংক্ষেপে লিখে নেওয়া দরকার। সৃষ্টিধর্মী মন দিয়ে কর্ম-শিক্ষা করতে হবে। শরীর-শিক্ষায় নিয়মানুবর্তিতা রাখার দরকার খুব বেশি, প্রতিদিন শৃঙ্খলার সঙ্গে অভ্যাস করা চাই। মৌখিক পরীক্ষার জন্যে অধীত বিষয় নিজে নিজে বলার অভ্যাস করলে বলবার শক্তি বাড়বে।"

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীমতী নিভা দাশগুপ্ত আরও জানালেন যে, তাঁর মতে কিশোর কিশোরীদের জন্যে পাক্ষিক আনন্দমেলার মতো পত্রিকার প্রয়োজন খুবই বেশি। এই পত্রিকা পড়ে ওরা মানসিক পরিপুষ্টি লাভ করে।

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

ক্লাস টেনের ফার্স্ট গার্ল জয়ন্তী বিশ্বাস তিনটে সেকশানের মধ্যে প্রথম হয়ে ক্লাস নাইন থেকে টেনে উঠেছে। চেতলায় জয়নুদ্দিন মিস্ত্রি লেনে থাকে। বয়স ১৪ বছর। বাবা সরকারি চাকরি করেন। এই স্কুলে জয়ন্তী ক্লাস ওয়ান থেকেই পড়ছে। ষষ্ঠশ্রেণী থেকে বরাবরই ক্লাসে প্রথম হচ্ছে। সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লাসে দ্বিতীয় হয়, সেইজন্যে ওর সঙ্গেই জয়ন্তীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশি। জয়ন্তী রোজ সকালে দু'ঘণ্টা ও রাত্তিরে চার ঘণ্টা পড়ে। ছুটির দিন দুপুরে ঘণ্টা-আড়াই অঙ্ক কষে। পড়ার চেয়ে লেখার দিকেই বেশি জোর দেয় জয়ন্তী। প্রতিটি বিষয়ই লিখে-লিখে তৈরি করে।

বাড়িতে বাবা ইংরেজি পড়ান, অন্যান্য বিষয় পড়ান ছোটকাকা। মা মাঝে-মাঝে বাংলা ব্যাকরণ দেখিয়ে দেন। জয়ন্তীর কোনো গৃহশিক্ষক নেই। স্কুলের শিক্ষিকারাও প্রশ্নের উত্তর দেখে দেন এবং পড়াশোনায় যথাসাধ্য সাহায্য করেন। জয়ন্তীর প্রিয় বিষয় লাইফ সায়ান্স। বড় হয়ে তার ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে আছে। অবশ্য সবটাই নির্ভর করছে পরীক্ষার ফল কী রকম হয়, তার ওপর।

বাড়িতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখে জয়ন্তী। গান শেখাবার জন্যে মাস্টারমশাই আছেন।

পাক্ষিক আনন্দমেলা জয়ন্তীর খুব প্রিয়। সে এই পত্রিকার লেখাপড়া বিভাগ থেকে অনেক উপকার পেয়েছে। প্রধান শিক্ষক ও ফার্স্ট বয়ের সাক্ষাৎকার থেকে অনেক কিছু জানতে পেরেছে। কমিক্সের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগে টিনটিন।

ছবি: তপন দাশ

বাঘা

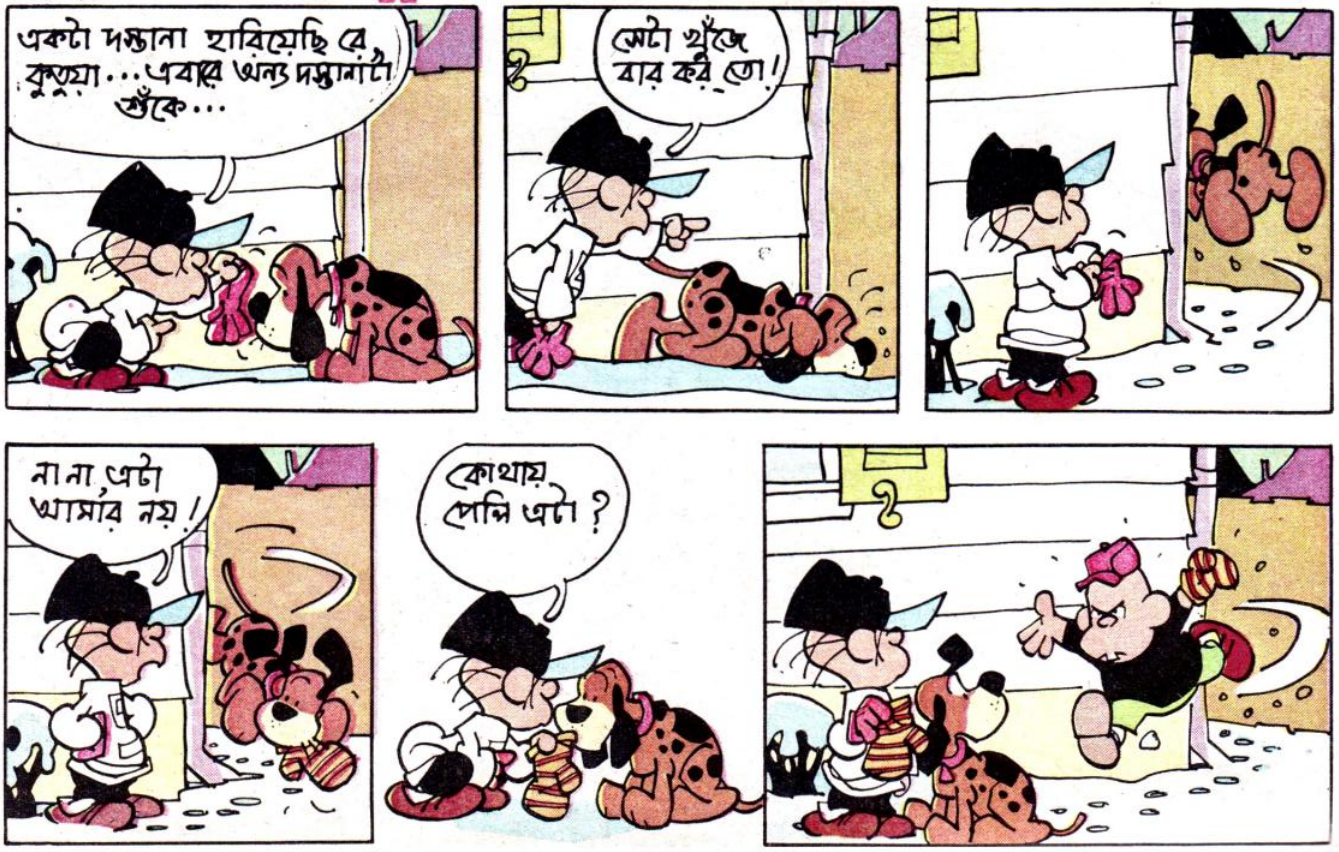
একটা দস্তানা হারিয়েছি রে কুত্তুয়া...এবার অন্য দস্তানাটা শুঁকে...
সেটা খুঁজে বার কর্ তো!
না না এটা আমার নয়!
কোথায় পেলি এটা?

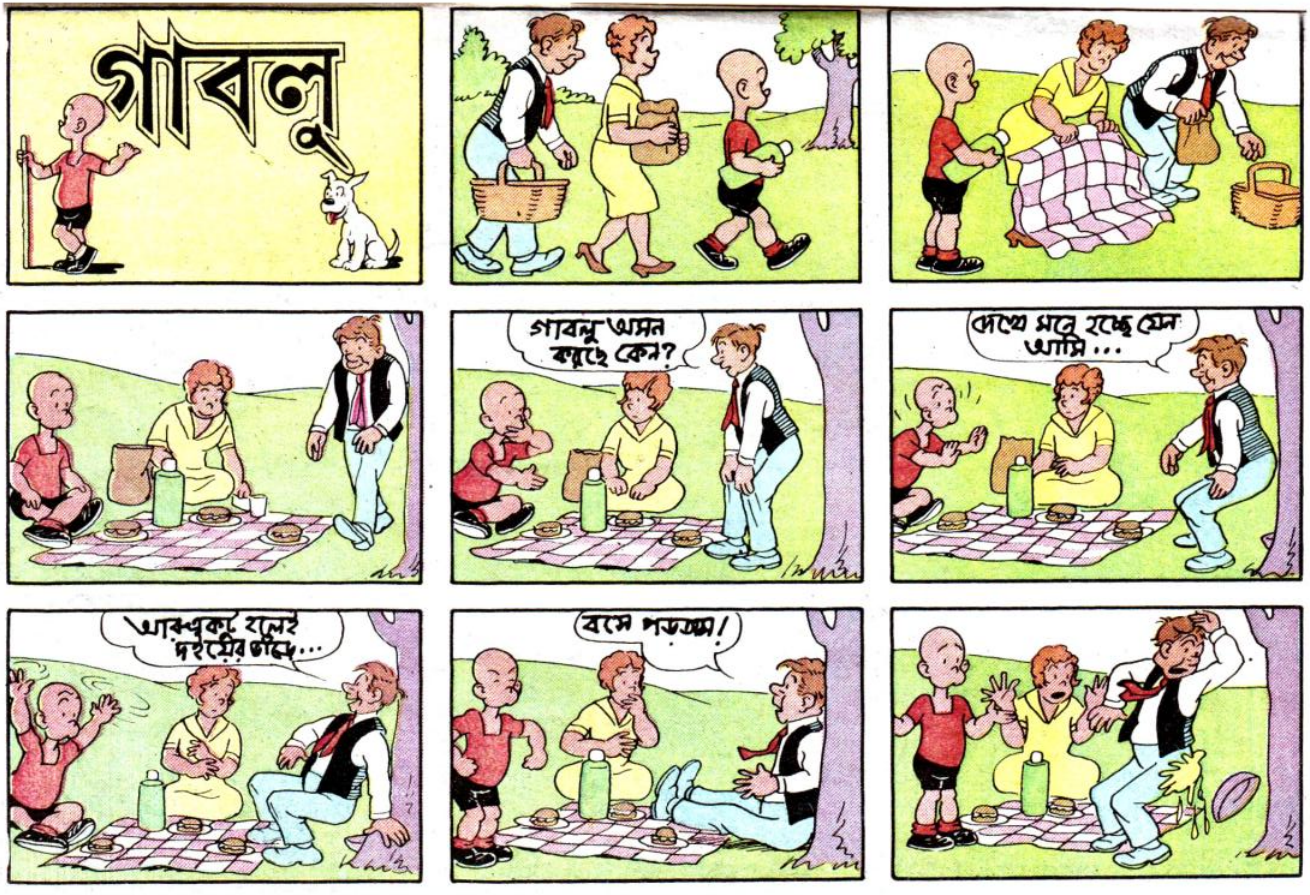

গাবলু
গাবলু অমন করছে কেন?
দেখে মনে হচ্ছে যেন আমি ...
আরএকটু হলেই দইয়ের ভাঁড়ে...
বসে পড়তাম!

আঁকো : পাখি

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

এর আগে সহজ আকারের মধ্যে খুঁজে পেয়েছ নানান জন্তু-জানোয়ার। এবার সেই সহজ আকারের ভেতর দিয়ে খুঁজে নাও তোমার পছন্দ-মতো পাখিকে। নমুনার আকারের দিকে নজর দিয়ে আসছে বারের জন্য অপেক্ষা করো।

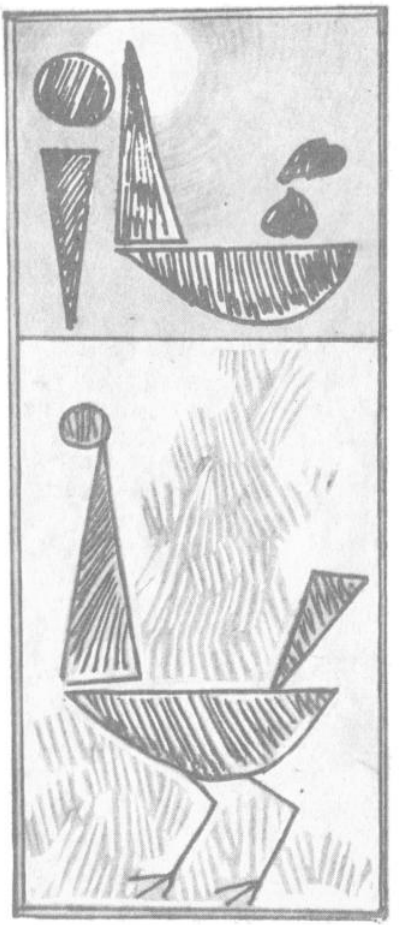

কাগজের খেলনা : বাহারি ঝোলনা

কারিগর

একই জিনিসপত্র দিয়ে শুরু করো এই কাজ। তোমার মাপ অনুযায়ী ১নং নমুনা মাফিক কাগজে দাগ কেটে মাঝ-বরাবর ভাঁজ দিয়ে (গ—গ) ২নং নকশার মতো করে নাও। এবার মাথার অংশের খানিকটা বাদ দিয়ে বাকি অংশকে সমান ভাবে ভাগ করে কেবল প্রথম দিকের গোড়ার ভাগটিকে কেটে বাদ দিয়ে দাও।

মনে রাখো — গোড়ার অংশটি কেটে বাদ দিলে ঝোলনার গোল আকারটি আসবে সমান আর সহজভাবে।

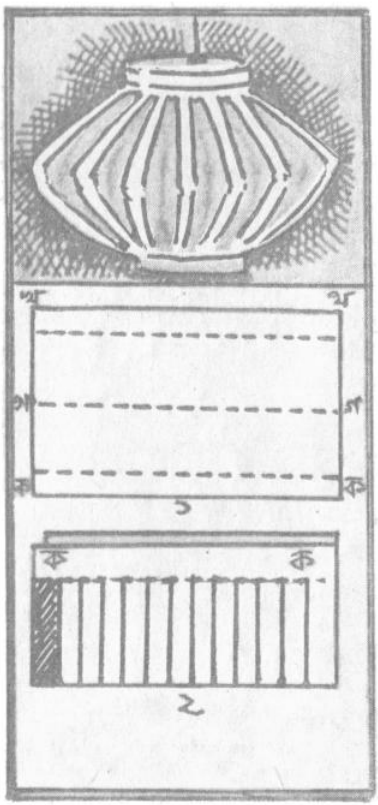

“নিখুঁত পরিষ্কার”

“হুইল যে কি জিনিষ, আমার বৌমাটি তো তা জানতোই না। এইসব নতুনের দলেদের কি আর বলব, এখনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে কত সাশ্রয় হয় তা ওকে বোঝালাম—আর এও বললাম যে, প্রতিটি বার-এ চারটি ক'রে ভাগ থাকে। আর তারপর ও এই বিপুল ফেনার রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক! হুইল-এ কাপড় কাচলে কাপড় পরিষ্কারও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও যায় অনেক বেশী! তাই তো এখন হুইল-এর ওপর ওর দারুণ বিশ্বাস জন্মে গেছে—সাবানের আর দরকারটাই বা কি বলুন তো?”

হুইল

দারুন ধোলাই শক্তি– চড়া দাম থেকে মুক্তি!

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-WL.12-1810 BG

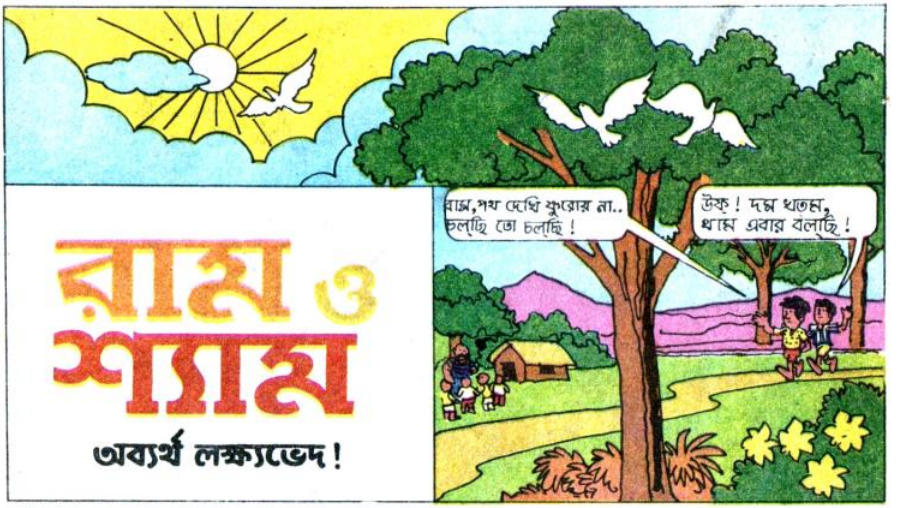

রাম ও শ্যাম
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ!
রাম, পথ দেখি ফুরোয় না.. চলছি তো চলছি!
উফ্! দম খতম, থামি এবার বলছি!
আরে দেখ, আমার কি সন্দেহ হচ্ছে... ঐখানে কিছু একটা গড়বড় ঘটছে! এক পাজী জোচ্চোর বাচ্চাদের ডেকে... বাজে সুইট্‌স বেচছে জোর গলায় হেঁকে!
ওগুলি সব পপিন্সের নকল ভেজাল... খেলে পরে বাচ্চাদের পেটের হবে গোলমাল.!
যাও শ্যাম, বাচ্চাদের ওগুলো খেতে করো গে নিষেধ...
আমি আসল পপিন্স দিয়ে ব্যাটাকে করি লক্ষ্যভেদ!
ব্যাটা এক মারেই কুপোকাত... আমি ধরছি গিয়ে ঘাড়ে... লোক ঠকানোর কি সাজা, ব্যাটা বুঝছে হাড়ে হাড়ে!
এবার আসল পপিন্সে বাচ্চাদের খাওয়াও জোরদার... আসল পপিন্স খেয়ে সবাই করে জয়-জয়কার!
খেতে ভাল
দেখতে ভাল
ভাবতে ভাল
পার্লে
পপিন্স
মিষ্টি ফলার
POPPINS
৫ রকম ফলের স্বাদে ভরপুর—রাস্‌বেরী, আনারস, লেবু, কমলালেবু ও সুসম্বী।